প্রবাল দাশগুপ্ত

কথার ক্রিয়াকর্ম

কথার ক্রিয়াকর্ম

কথার ক্রিয়াকর্ম

প্রবাল দাশগুপ্ত

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯৪ । জুলাই ১৯৮৭

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

পঁচিশ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রক : শিবনাথ পাল । প্রিন্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০০০৪

উৎসর্গ

বিদেশী-ভাষা-খেলার বাল্যসঙ্গী

শ্যামলদাকে

সূচি

ভূমিকা

উন্নতিকামী দেশে সংস্কৃতি আর শিক্ষার গুরুত্ব খুবই বেশি। শিক্ষার্থীর মন যেদিকেই আকৃষ্ট হোক না কেন, চিন্তা আর প্রকাশের স্বচ্ছন্দ স্পষ্টতার দরকার আছে প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে। ভাষার ওপর দখল তাই না থাকলেই নয়।

এক অর্থে অবশ্য ভাষার ওপর দখল সবারই থাকে। বাচ্চারা আপনা-আপনিই কথা বলতে শেখে। সব বাচ্চাই শেখে এটা। কিন্তু এই স্বাভাবিক 'কথা বলা'-র চৌহদ্দি যথেষ্ট ব্যাপক নয়। আধুনিক সমাজ বড়ো জটিল জায়গা। আগের চেয়ে অনেক সাবধানে পা ফেলতে হয় আজকাল। আমাদের ভাষাও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। একেলে আর শহুরে হ'তে হচ্ছে ক্রমশ সবাইকে। কী ক'রে সুস্থ একাল আর সুশ্রী শহর গড়া যায় সেটা ভাববার দরকার টের পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেক পদক্ষেপে।

এ কথা ঠিক যে এই অনুভূতি এখনও অনেকের মনে অস্পষ্ট। কিন্তু সংকটের বোধ আর উত্তরণের জন্যে উদ্যোগী হওয়ার সংকল্প ইদানীং ছড়িয়ে পড়ছে মফস্বলে আর গ্রামেও। বেঁচে থাকার পুরোনো নতুন নানা মুশকিল দিন দিন বেড়েই চলেছে। মুশকিল গায়ের ওপর এসে পড়লেই মানুষ ভাবতে বসে ; এ তো জানা কথা। যার মুশকিল নেই তাকেই তো বলি নিশ্‌-চিন্ত (চিন্তাহীন) অথবা ভাবনাহীন। লিখতে পড়তে জানেন এমন মানুষের সংখ্যা দশ বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে আজ অনেক বেশি। লেখার দরকার (আর কিছু না হ'ক অন্তত সাধারণ চিঠি লেখার দরকার) ভাষা ব্যবহার করার কৌশল নিয়ে আজ ভাবনায় ফেলছে এমন অনেককে যাঁদের পূর্বপুরুষের মহলে লেখাপড়ার চল ছিল না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই অনেকে কৌতূহলী হয়ে উঠছেন ভাষার সহজ কঠিন নানারকম প্রশ্ন নিয়ে। আমাদের বেশির ভাগ কৌতূহল বাঙলা ভাষাকে কেন্দ্র ক'রেই। কিন্তু যাঁরা বেশ খানিকটা লেখাপড়া জানেন এমন কেউ কেউ ভারতের অন্যান্য ভাষা, তার বাইরে ইংরিজী,

এস্পেরান্তো, ফরাসী, নানা ভাষার সঙ্গে বাঙলাকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন।

কোনো প্রশ্নেরই যদি উত্তর না জোটে তাহলে কৌতূহল আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে। অন্তত কয়েকজন পাঠকের জিজ্ঞাসা যাতে আরো কিছু দিন সজীব থাকে সেইজন্যে এই বইয়ে ভাষা, বাঙলা ভাষা, ভাষা-বিষয়ক চিন্তা করার রীতি—এইসব প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা জড়ো করা রইল। এগুলো বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত ; রচনা আর বানানের রীতি নানারকম আছে, তাই থাকতে দিলাম।

এ বইয়ে অল্পই বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলবেন, কৌতূহল অতৃপ্ত র'য়ে গেলো। সেটা তো ভালোই। এ ধরনের আলোচনায় তাহ'লে আরো অনেকে যোগ দেবেন।

নিশ্চয় অল্পবিস্তর ভুল থেকে গেলো এ বইয়ে। 'বিজ্ঞান, সত্যি কথা, আর শত পুষ্প' নিবন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে এটা অবশ্যম্ভাবী। ভুল শুধরে শুধরেই বিজ্ঞান এগোয়। ভুল করার আর ভুল ঠিক করার পদ্ধতিরই নাম বিজ্ঞান। 'যা বলছি সব সত্যি কথা' এমন দাবি থাকে ধর্মগ্রন্থে, বিজ্ঞাপনে, প্রেমপত্রে, খবরের কাগজে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়—এগুলোর কোনোটাই বৈজ্ঞানিক উপস্থাপন নয়, বলাই বাহুল্য।

বিজ্ঞানের প্রাণ হ'লো সমাজে সব কিছু নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার আবহাওয়া। বৈজ্ঞানিক লেখার কাজ হ'লো সুস্থ আলোচনার উদ্রেক করা। অর্থাৎ আর সব কিছুর পূর্বশর্ত এই যে বিজ্ঞান-বিষয়ক নিবন্ধ বোধগম্য হওয়া চাই। পাঠক যেন লেখাটা প'ড়ে বুঝতে পারেন এবং বিষয়টা নিয়ে নিজের মতামত গুছিয়ে নিতে পারেন।

আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবী বা 'আঁতেল' সম্প্রদায়ের বেশি বেশি বিদগ্ধ রচনারীতি অনেক পাঠককে ঠেলে সরিয়ে দেয়, তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। অথচ ভাষা নিয়ে এই পাঠকদেরও বক্তব্য থাকতেই পারে। 'টায়ে টোয়ে' আর '"ন্যাকা" শব্দের অর্থকথা'-য় সেই বৃহত্তর পাঠকশ্রেণীর কাছে অল্প কিছু বক্তব্য পরিবেশন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আর কিছু পাঠক আছেন যাঁরা ওধরনের 'জনবাদী' ('শস্তায় জনপ্রিয়তা কেনা') ভঙ্গি দেখলে অস্বস্তি বোধ করেন। স্পষ্টতই, পাঠকের যখন অস্বস্তি হচ্ছে তখন তিনি বিষয়ের দিকে মন দিতে পারেন কম, এবং বক্তব্যের

সুচিন্তিত সমালোচনা তাঁর কাছ থেকে তখন প্রত্যাশা করতে পারি না। অথচ বুদ্ধিজীবী পরিশীলনপ্রিয় পাঠকের সমালোচনাও নিশ্চয়ই দামী। 'দুই সোস্যুরের ভাষাচিন্তা', 'সর্গে গোলযোগ', 'কারক : দুঃস্বপ্নের আসান', 'বাঙলা অব্যয় "যে"', আর 'বৈজ্ঞানিক কল্পনার ভগীরথের ভূমিকায় চমস্কি' এই ধরনের পাঠকের কথা মনে রেখে লেখা হয়েছে।

সত্য-সন্ধানের কাজটা ঠিক কী, অর্থাৎ বিজ্ঞান কাকে বলে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা করার কী রীতি—এ ব্যাপারে সবারই আগ্রহ থাকার কথা। গোটা বইটাই মোটের ওপর বিজ্ঞানের বই, যদিও অবিজ্ঞানের কথাও আছে এতে। 'বিজ্ঞান, সত্যি কথা, আর শত পুষ্প' তাই সব পাঠকের জন্যে, এবং আশা করি পড়তে অসুবিধে হবে না কোনো পাঠকেরই।

কোন লেখা কীরকম পাঠকের জন্যে সেই বিচার করলে লেখাগুলো কী কী শ্রেণীতে পড়ে তা মোটামুটি বললাম। এবার আসা যাক বিষয় বিভাগের প্রসঙ্গে। 'বিজ্ঞান, সত্যি কথা, আর শত পুষ্প'-র বিষয় নিয়ে কথা হ'লো একটু আগে। অন্যান্য লেখার বিষয় কী?

ভাষার অন্যতম জরুরী একক বাক্য আর পদ। 'রাম শ্যামকে চেনে' বাক্য। 'রাম', 'শ্যামকে', আর 'চেনে' পদ। বাক্যে কোন পদ কোথায় ব'সে কী কাজ করে, এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টার নাম অন্বয় বা সিনট্যাক্স। 'সর্গে গোলযোগ', 'বৈজ্ঞানিক কল্পনার ভগীরথের ভূমিকায় চমস্কি', 'কারক : দুঃস্বপ্নের আসান' আর 'বাঙলা অব্যয় "যে"'-র বিষয় অন্বয়।

পদের ভেতরে কাজ করে পদের অঙ্গ। 'স্বনির্বাচিত' পদের অঙ্গ 'স্ব', 'নির্', 'বাচ্', আর 'ইত'। অঙ্গবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি নিয়ে কোনো আলোচনা না থাকলেও 'টায়ে টোয়ে' লেখাটাতে আছে অঙ্গবিজ্ঞান আর অন্বয় মেলানো কিছু কথা। ভাষার সমগ্রতায় অঙ্গবিজ্ঞান আর অন্বয়ের স্থান আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করা রইলো 'দুই সোস্যুরের ভাষাচিন্তা'-য়। এই লেখায় আন্তর্জাতিক ভাষা এস্পেরান্তোর উল্লেখ আছে র্যনে দ্য সোস্যুরের গবেষণার সূত্রে। ভাষাবিজ্ঞানে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের পক্ষে এস্পেরান্তো শিখে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ শিক্ষার্থীকে অন্বয় আর অঙ্গবিজ্ঞানের অনেক নির্বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন আর সমাধানের পথে এগিয়ে দেয় এই সুগঠিত ভাষার প্রাঞ্জল বিন্যাস।

'"ন্যাকা" শব্দের অর্থকথা'-র বিষয় 'ন্যাকা' শব্দের অর্থ। অন্বয় আর

অঙ্গবিজ্ঞান ব্যাকরণের ব্যাপার ; কথার মানে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে ব্যাকরণের উল্টো পিঠ, অভিধান। বহুব্যবহৃত অভিধান 'চলন্তিকা'-য় আছে, 'ন্যাকা' মানে নাকি 'অজ্ঞতা সরলতা বা সাধুতার ভানকারী'। 'ন্যাকা' কিন্তু আসলে অতো সরল নয়। বিষয়টা নিয়ে আমাদের অজ্ঞতা যাতে একটু কমে সেই চেষ্টা করা হয়েছে ' "ন্যাকা" শব্দের অর্থকথা'-য়।

নিবন্ধগুলো কাদের জন্যে লেখা, কী নিয়ে লেখা, এর পর প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন লেখা ? ভাষাবিজ্ঞানের সার্থকতা কোথায় ?

এর একটা উত্তর বোধহয় স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মনে হবে যে কোনো সচেতন বাঙালীর। 'আ মরি বাঙলা ভাষা' আর 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইর‍্যা নিতে চায়' গাইবার পরের সোপান নিশ্চয়ই বাঙলা ভাষার সযত্ন অনুশীলন। এই ভাষার আনাচে কানাচে ঘুরে দেখা চাই। সেই ভ্রমণসূচীতে যদি দু-চারটে অন্য ভাষাও এসে পড়ে তাহলে সেই জরুরী তুলনাগুলোও না করলেই নয়। প্রথাবদ্ধ সংস্কৃত আর ইংরিজী ব্যাকরণের ভাণ্ডার থেকে এটা-সেটা ধার ক'রে এনে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা যে কাঠামো এখনকার বিদ্যালয়পাঠ্য 'বাঙলা ব্যাকরণ'-এ উপস্থাপিত, সেই দুঃস্বপ্ন থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। উত্তীর্ণ হ'তে হবে বাঙলা ভাষার প্রকৃত জ্ঞানের জগতে।

আমরা বাঙালীরা যুক্তিশীল নই, ভাবালু, বীরপূজারী ইত্যাদি যেসব বহুপুনরুক্ত অভিযোগ আছে সেগুলোর অল্পবিস্তর যাথার্থ্য থাকতেই পারে। যার যা ধরন। কিন্তু সবাই জানে যে বাঙলা ভাষা আর সংস্কৃতির জোয়ার-ভাঁটা বাঙালীদের সাধারণ জীবনে সত্যিই প্রবাহ তোলে। নতুন জ্ঞান যদি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাষার সম্পর্কটাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ক'রে তোলে এবং দু-এক পুরুষ বাদে এই প্রত্যক্ষতা যদি আমাদের সাহিত্যে নতুন দৃপ্তি আর স্বাদ আনতে সাহায্য করে, তাহলে অনেক লোকের মনে নতুন স্ফূর্তি আসবে। এবং সেই উৎসাহের সঞ্চার হবে অনেকের কর্মজীবনেও, উৎপাদনের যন্ত্রতন্ত্রে। প্রক্রিয়াটা স্বাভাবিক। আমাদের জীবনের বহু দিক আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই অর্থে আমাদের স্ব-অধীনতা (স্বাধীনতা) আসতে অনেক দেরি। নিজেদের ভাষাকে সজ্ঞান চেতনার আয়ত্তে আনার জন্যে যতটা উদ্যমী হয়ে মনকে জাগিয়ে তুলতে হবে, সেই একই উদ্যমী জাগরণের ধাক্কা আরো পাঁচরকম

প'ড়ে-থাকা কাজে হাত দিতে প্রবুদ্ধ করবে অনেককেই ; এবং এইভাবে আমরা পর পর বহু ক্ষেত্রে খাঁটি স্ব-অধীনতা অর্জন করব।

কেউ কেউ হয়তো এ বক্তব্য মানবেন না। বলবেন, সংস্কৃতিতে সাহিত্যই জরুরী। কোনো জাতির স্বাধীনতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'তে পারে না ভাষা নিয়ে (অর্থাৎ কথার নিছক সংস্থান বা মানে নিয়ে) মাথা ঘামানো।

কিন্তু সাহিত্যকেও তো নিজের ক'রে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে। কেউ যদি, ধরা যাক, কমলকুমার মজুমদারের গল্প উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবতে বসেন, তাঁকে যে অন্তত কমলকুমারের ভাষা নিয়ে ভাবতে হবে একথা সবাই মানবেন। এই বিশেষ ধরনের বাঙলা ঠিক কী কী ব্যাপারে বিশেষ সেটা তো জানা দরকার। কমলকুমারের গদ্যে 'যে এবং' এই অব্যয়সমুচ্চয় মোটেই বিরল নয়। এটার বৈশিষ্ট্য বুঝতে হ'লে খেয়াল করা ভালো যে বাঙলা অব্যয় 'যে' যখন আশ্রিত বাক্যের পূর্ববর্তী তখন তার ভূমিকা যোজকের (এই বইয়ের 'বাঙলা অব্যয় "যে"' দ্রষ্টব্য)। নিশ্চয়ই 'যে'-র যোজকভূমিকার মতো বাঙলা ভাষার এখনও অজানা আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা কমলকুমার-প্রমুখ সাহিত্যেকের ভাষাপ্রয়োগ ঠিকমতো বোঝার ব্যাপারে চাবির কাজ করবে। সাধারণ বাঙলা ভাষা নিয়ে ভালো ক'রে ভাবতে রাজি না হ'লে অসাধারণ বাঙালীর ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরা যাবে না।

আজকাল দেশে বিদেশে পরিচয় বা আইডেনটিটি নিয়ে রব উঠেছে। এর অনেক আগে থেকেই আমরা বাঙালী পরিচয়ের ওপর জোর দেওয়া শুরু করেছি। সেই সময় থেকেই কোনো কোনো বাঙালী সবার হ'য়ে দায়িত্ব নিয়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের ইতিহাস লিখেছেন অথবা ইতিহাস লেখার মালমসলা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। ভাষা-সংস্কৃতির জীবনে ধারাবাহিকতা রাখার কাজে ইতিহাস যে অপরিহার্য সহায় এটা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হয়নি।

এখন সময় হয়েছে জেনে নেবার যে ভাষাবিজ্ঞানও এইরকমই এক অপরিহার্য সহায়। এর সাহায্যে আমরা আমাদের জাতিগত পরিচয়ের সমৃদ্ধ ছবি তুলে ধরতে পারব। তবেই পারব এই পরিচয় পুরোপুরি অর্জন ক'রে নিতে।

বাঙালী পরিচয়ের মহিমা তুলে ধরাই ভাষাবিজ্ঞানের একমাত্র কাজ হ'তে পারে না অবশ্য। যে কোনো সত্যি কথাকেই খুব বেশি কচলালে সেটা সেটা মিথ্যের দিকে চ'লে যায়। বাঙালিয়ানাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ এ ঝোঁক আমাদের এমনিতেই বদ্ধমূল। তাই ভাবা দরকার ভাষাবিজ্ঞান আর কী কাজে লাগে।

ভাষাবিষয়ক ভাবনা আমাদের কথার মানে থেকে ক্রমশ সেই মানেটার বিন্যাসের দিকে অর্থাৎ চিন্তার বিন্যাসের দিকে নিয়ে যায়। দর্শনে যুক্তি আর তর্ক বোঝার যে চেষ্টার নাম ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক, তার সঙ্গে ভাষা-বিজ্ঞানের ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা আজ হাত মেলাচ্ছে। জ্ঞানগত (কগনিটিভ) মনোবিজ্ঞানও এই প্রকল্পে অংশীদার। তিন গবেষণাক্ষেত্রের সমবেত চেষ্টায় আগামী শতাব্দীতে মানুষের চিন্তার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে—চিন্তার রীতি, চিন্তার বিষয়, এর ব্যাপক চেহারা, এর খুঁটিনাটি, সব। ভাষাবিজ্ঞানের এই দুরূহ বিমূর্ত দিকের কথা এ বইয়ে নেই। 'কী কাজে লাগে?' এ প্রসঙ্গ উঠলে গবেষণার সবচেয়ে মূল্যবান দিগন্ত নিশ্চয়ই উল্লেখ করা দরকার; কিন্তু সেই দিগন্তের সত্যিকারের আলোচনা এখন সম্ভব নয়। আগে আমাদের সমাজে ভাষা নিয়ে কথা বলার অভ্যাস চালু হোক। হাঁটতে না শিখে দৌড়োনো যায় না।

বাঙলা ভাষায় দর্শন আর মনোবিজ্ঞান চর্চার পরিমাণ অবশ্য শোচনীয়। আধুনিক ন্যায়শাস্ত্র বা জ্ঞানগত মনোবিজ্ঞান নিয়ে তো কিছুই নেই বাঙলায়। তাই বাঙলায় ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছে, ফলপ্রসূ আলোচনার জগতে তার জীবন যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্যে এ ভাষায় যেসব বিষয় নিয়ে সত্যিই চর্চা হচ্ছে সেইসব গবেষণাধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা দরকার। এই সূত্রে সমাজবিজ্ঞানের কথা ভাবা চলে। নৃবিজ্ঞান মারফত সমাজবিজ্ঞানের ওপর প্রত্যক্ষ আর ইতিহাসের ওপর পরোক্ষ ছায়া পড়েছে গ্রন্থনবাদ বা স্ট্রাকচারালিজমের। এই গবেষণারীতির জন্ম হয়েছিলো চমস্কি-বিপ্লবের আগেকার সোস্যুর-প্রবর্তিত ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাবে। যথারীতি দশক-দেড়েক দেরি ক'রে গ্রন্থনবাদের ফরাসী হাওয়া, বিযুক্তিমনস্ক অস্তিত্ব-বাদের শূন্য হুজুগ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে এসে পৌঁছেছে। বাঙলা পত্রপত্রিকার জগতে কিছু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। গ্রন্থনবাদের উদ্যোক্তা ফেয়্যারদিনাঁদ দ্য সোস্যুরের চিন্তার

সঙ্গে পরিচয় ঘটলে সেই আলোচনা অনেকটা স্পষ্টতা পায়। 'দুই সোস্যুরের ভাষাচিন্তা' নিবন্ধে এই পরিচয়-সাধনের কিছু প্রাথমিক চেষ্টা আছে—আরো উপস্থাপন দরকার।

সমাজবিজ্ঞানের নতুন নতুন সূত্র যদি আমাদের জটিল সমাজের সমস্যা ঘোচাতে গিয়েই আবিষ্কৃত হয় তাহ'লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আশা করা যায় যে আধুনিকতম ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে তেমন নতুন সমাজচিন্তার মৌলিক মিলন প্রথম ঘটবে বাঙলা ভাষায় লেখা কোনো প্রবন্ধেই ; উচ্চাশা আর আত্মবিশ্বাস না থাকলে বড়ো কাজ করা যায় না। বলা বাহুল্য, সমাজচিন্তায় নতুন সূত্র আবিষ্কারের প্রশ্নের সঙ্গে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার প্রশ্নও জড়িত। বিপ্লব বিশ্লেষণনির্ভর।

সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, বা সাহিত্যসমালোচনাকে আজ ভাষাবিজ্ঞান থেকে গ্রন্থনবাদী চিন্তার সরঞ্জাম ধার নিতে হচ্ছে কেন ?

বহির্জগতের বিভিন্ন বিজ্ঞান—রসায়ন, ভূবিদ্যা, জীববিজ্ঞান—ক্রমশ পদার্থবিজ্ঞানের বুনিয়াদের ওপর এসে দাঁড়াচ্ছে। বিদ্যার যেসব শাখার বিষয় মানুষের অন্তর্জগৎ সেগুলোও যেন তেমনি ভাষাবিজ্ঞানকে একরকম কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ভাষার একটা দিক সুশৃঙ্খল, আরেকটা দিক যদৃচ্ছ ; এ দুয়ের আলো-আঁধারি ঠাউরে নিতে ভাষাবিজ্ঞানী যদি পারেন তাহলে তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও সমাধান পেয়ে যান।

গোটাকতক উদাহরণ ধরা যাক। প্রতিশ্রুত প্রতিশ্রুতি, বিকৃত বিকৃতি, অনুভূত অনুভূতি, সংহত সংহতি, পুষ্ট পুষ্টি—এই পর্যন্ত দেখে মনে হয় বেশ চলছে। কিন্তু প্রীত প্রীতি বা প্রগত প্রগতিতে এসে ঠেকে যাই ; 'প্রীত' কথ্য বাঙলায় চালু নেই, 'প্রগত' কোনোরকম বাঙলারই নিজস্ব শব্দ নয় (মারাঠিতে প্রচলিত), যদিও এর মানে আন্দাজ করা সহজ। সংগত সংগতি নিয়ে মুশকিল অন্য ধরনের—'ক-এর সঙ্গে খ-এর সংগতি আছে'-র তুল্যমূল্য নয় 'ক-এর (সঙ্গে) সংগত খ', অন্য দিকে 'যুক্তিসংগত'-র পাশাপাশি আমরা, অন্তত প্রচলনে, 'যুক্তিসংগতি' পাই না। ক্ষত আর ক্ষতির তো কোনো স্পষ্ট যোগই নেই। যোগ না থাকার আরও মজার দৃষ্টান্ত হয়তো অব্যাহত-অব্যাহতি ; ব্যাহত-র সঙ্গে ব্যাঘাত-এর যে যোগটুকু ছিল সেটা ছিঁড়ে যায় অব্যাহত-য় এসে ('অব্যাঘাত' বলি না)।

তাহ'লে কি প্রতিশ্রুতি বিকৃতি অনুভূতি সংহতি পুষ্টি নিয়ে কোনো সূত্র

রচনা করা যায় না ? যায় বইকি। কিন্তু এটা সূত্রই, শৃঙ্খল নয়। এ সুতো এক জায়গায় গিয়ে ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু যতক্ষণ সূত্রের কাজ ততক্ষণ মনে হয় প্রায় পদার্থবিজ্ঞানের মতো অমোঘ শৃঙ্খলার ব্যাপার, যদিও ছোটো মাপের।

এর সঙ্গে তুলনীয় 'বাঙলা অব্যয় "যে" '-তে নোঙর-বিষয়ক আলোচনা। নোঙরদের আচরণ অনেক বেশি পদার্থবিজ্ঞানের কথা মনে করিয়ে দেয় ; সূত্রটা এলিয়ে যায় না। অঙ্গবিজ্ঞানে যে নৈরাজ্য, অন্বয়ে তার জুড়ি কম, শৃঙ্খলা বেশি। অন্য দিকে—এ বইয়ে আলোচনা নেই—ধ্বনিবিজ্ঞানও আরেকরকম সুশৃঙ্খলার এলাকা।

অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানে শৃঙ্খলাপ্রধান বিশ্লেষণরীতি প্রযোজ্য (যাতে গণিতের ভাগ বেশি) না শিথিল আংশিক সূত্রের কথাই ভাবা ভাল (যেন গল্প বলা হচ্ছে) এ প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণের স্তরভেদে বেশ নাটকীয়ভাবে বদলায়। জীববিজ্ঞানের মতো ভাষাবিজ্ঞানেও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিছু শৃঙ্খলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অবিশ্বাস্য আপাত বিশৃঙ্খলা। এটাকেই বলছি আলো-আঁধারি। এবং এখানেই মানবিক অন্তর্জগৎ নিয়ে ব্যাপৃত অন্যান্য বিদ্যার গবেষকদের শেখার কিছু থাকতে পারে মনে হয়।

আইন আর খেয়ালের এই নিয়মিত সহাবস্থান নিশ্চয়ই কোনো উচ্চতর পর্যায়ের নিয়মের মূর্তিতে ধরা দেবে এক দিন। তাকেও বলবো বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান। অর্থাৎ, বিজ্ঞান বলতে আমরা এখন সচরাচর যে বিমূর্ত গণিতাশ্রয়ী ব্যাপারটা বুঝি, যার মুখ্য উদাহরণ পদার্থবিজ্ঞান, তার পরিধি আজ পালটে যাচ্ছে মূর্ত বা আইন-খেয়াল-মেশানো বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে। বিজ্ঞানকে মূর্ত ক'রে তোলার ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞান যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার গুরুত্ব ক্রমশই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে অন্যান্য 'মানবিকী বিদ্যা'-তেও।

কিন্তু চমস্কি নিজে তো গণিতপন্থী, ভাষার সুশৃঙ্খল দিকগুলো নিয়েই ভাবিত। তার মানে, অন্বয়ের চমস্কি-বিপ্লব বিস্তৃত হ'য়ে আজ ভাষাবিজ্ঞানে (এবং হয়তো পরন্তু সব মানবিকী বিদ্যায়) যে বৃহত্তর আন্দোলন আনছে তা চমস্কির চিন্তার শ্রেষ্ঠ সারাংশেরই ব্যাপকতর প্রকাশ। এজন্যেই 'বিজ্ঞান, সত্যি কথা, আর শত পুষ্প' গণিতের ওপর অযথা জোর না দিয়ে লিখতে চেষ্টা করেছি, যাতে চমস্কির রচনার গণিতমুখী খোলসের আড়ালে তাঁর

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ঋদ্ধতর যে রূপ ছিল সেইটাকে আমাদের বিজ্ঞানবোধে গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য, বিজ্ঞানের রীতিমাফিক, এ সবই প্রস্তাবনামাত্র, উপসংহার নয়। যাঁরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত চান তাঁরা ভাষায় অথবা বিজ্ঞানে আতিথ্য পাবেন না।

সূচনা

এখানে প্রকাশিত প্রত্যেক প্রবন্ধেরই প্রথম লেখন ছাপা হয়েছিল পত্রিকায় (কৃত্তিবাস, বারোমাস, জিজ্ঞাসা)। সম্পাদকদের ধন্যবাদ—বিশেষ ক'রে, লিখতে প্রবৃত্ত করার জন্যে, শেষোক্ত দুই পত্রিকার সম্পাদক অশোক সেন আর শিবনারায়ণ রায়কে।

'বৈজ্ঞানিক কল্পনার ভগীরথের ভূমিকায় চমস্কি'-র দ্বিতীয়ার্ধ আর 'টায়ে টোয়ে' আমার ১৯৮০ সালের পি এইচ ডি থিসিসের কোনো কোনো অংশ অবলম্বনে লেখা। এই গবেষণায় যেটুকু শৃঙ্খলা আর স্পষ্টতা আছে তার জন্যে দায়ী নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ভাষাবিজ্ঞান-বিভাগপতি লুইস লেভীন (১৯৩০-৮২); বাকি দায়িত্ব আমার। 'সর্গে গোলযোগ' যে গবেষণার প্রতিবেদন সেই গবেষণার পর্ববিশেষে রশিদা বেগমের সহ-অবদান আছে এ কথা সে লেখাতেই উল্লেখ করেছি, এখানেও স্বীকৃতি জানাচ্ছি। 'বাঙলা অব্যয় "যে"' নিবন্ধে প্রযুক্ত 'অঙ্গবাক্য' শব্দটার আসল প্রস্তাবক মৃণাল নাথ; তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রে বুঝতে পেরেছি যে 'উপবাক্য' বলা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। 'তো' নিয়ে যাঁর লেখা প'ড়ে 'যে' নিয়ে লিখতে বসেছিলাম সেই অরুণ ঘোষও এখানে ধন্যবাদার্হ।

এ বইয়ের প্রুফ দেখতে রাজি হ'য়ে সুবীর রায়চৌধুরী আমাকে যেমন আগের মতোই আজও প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি পাণ্ডুলিপিতে বানান সর্বত্র সমান নয় ব'লে আপত্তিও করেছেন, যা তাঁর স্নেহেরই শাসন। পাঠকের কাছে এরকম প্রশ্রয় আশা করা অসংগত। বানানের কোনো নিয়ম সর্বত্র প্রযুক্ত হয়নি ব'লে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বিভিন্ন পত্রিকা তাদের বিভিন্ন নিয়মে বানান করেছে, সেইসব মুদ্রিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণের সময়ে ঠিক কোন্ নিয়ম সর্বত্র চাপিয়ে দেওয়া ভালো সে বিষয়ে দ্বিধা বোধ ক'রে শেষ পর্যন্ত আমাদের পত্রিকাগুলোর বানান-নৈরাজ্যেরই প্রতিফলন থাকতে দিয়েছি এ বইয়ে। এটা ক'রে নিশ্চয়ই ভালো করিনি।

ভাষাবিজ্ঞানের মূলসূত্র বাঙলায় উপস্থাপন করা কতটা জরুরী সে কথা

বারবার মনে করিয়ে দিয়ে এই বিষয় নিয়ে বাঙলায় লিখতে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে উদয়নারায়ণ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার উপলক্ষ হিসেবে কোনো রচনাবিশেষ উল্লেখ করার মানে হয় না। তেমনিই বিনা উপলক্ষে স্মরণ করি ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক আর পরেচশন্দ্র মজুমদারের অধ্যাপনার কথা এবং তাঁদের মারফত কলকাতায় বিদ্যাচর্চার যে ঐতিহ্যের স্বাদ পেয়েছি তার আদিপুরুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি ১৯৭৪ সালে স্বভাব-সিদ্ধ প্রশ্রয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আধুনিক আদলে বাঙলা ব্যাকরণ লিখছি কিনা। তখন লিখছিলাম না। আজ সে কাজে হাত দিয়েছি, সুনীতিবাবু নেই। তিনি বলতেন, 'আমার খালি নাড়ীজ্ঞান আছে। আজকাল যন্ত্র-সরঞ্জামের ব্যবহার জানা আধুনিক সব ডাক্তার তৈরি হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানে। তাদের কাণ্ডজ্ঞান বজায় থাকবে তো? নতুন পরিভাষা আর গণিতের ঝকঝকে মোহ তাদের বিভ্রান্ত করবে না তো? ভয় করে।' সুনীতিবাবু বাঙলার অতীত নিয়ে তাঁর যুগের প্রতিমানে যে অসাধারণ গবেষণা করেছিলেন, আমরা সমবেত প্রয়াসেও তার তুলনীয় পর্যায়ে বাঙলা ভাষার বর্তমানের বিবরণ কোনো দিন লিখতে পারব কিনা ভাবতে বসলে আমাদেরই কি ভয় করে না?

অথচ উপায় নেই। এ দায়িত্বটা আমাদের নিতেই হবে। দেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যে কথা আর লুকোচুরিকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা যেমন আজ বাড়ছে তেমনি সেইসঙ্গে জেগে উঠছে, এই প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে সৎ মানুষের প্রতিবাদ। বৈপরীত্যপূর্ণ এই সময়ে অনেকেরই সত্যি কথার ট্র্যাফিকের নিয়ম খেয়াল করতে শেখা দরকার। কেউ যখন কোনো একটা কথা বলে এবং সেটাকে ঠিক ব'লে ধ'রে নেয় তখন সেই কথাটা ঠিক হ'লে আর কী কী ঠিক না হ'য়ে পারে না—এটা বুঝতে শেখা মানে যুক্তি আর তর্কের বুনিয়াদী নিয়ম শেখা, যুক্তিতত্ত্ব শেখা। যুক্তির নিয়ম কোনো নিছক খেলার নিয়ম নয়। সত্যি মিথ্যে যখন জীবন মরণের প্রশ্ন হ'য়ে ওঠে সেই সংকটের সময়ে যুক্তিতত্ত্বও আর দার্শনিকতার খেলাঘরে আবদ্ধ থাকে না, সমকালের যুদ্ধক্ষেত্রে নামে। আমাদের যুগ শরীরমনস্ক যুগ। যুক্তি-তর্কের বাহন যে ভাষা, তার শারীরবৃত্তেই আধুনিক যুক্তিতত্ত্বের খুঁটি। তাই যে কোনো আধুনিক সমাজে ভাষাবিজ্ঞানীর দায়িত্ব অনেক। আমাদের আস্তে আস্তে আসরে নামতেই হবে।

সেই সমাজই আধুনিক যার সংকল্প হ'লো জীবনকে সবরকম খামখেয়ালী স্বৈরাচারের জুলুম থেকে মুক্তি দেওয়া—গায়ের জোর, ভয়ের জোর, প্রথার জোর, স্নেহান্ধতার জোর, টাকার জোর, কূপমণ্ডূক বৃত্তের মলিন চটুলতার জোর থেকে জীবনকে রেহাই দেওয়া, সত্যসন্ধিৎসার ওপর দাঁড় করানো। সত্যের জোর তখনই জুলুমের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠতে পারে যখন এমন শিক্ষিত জনসমাজ গ'ড়ে ওঠে যার মন সজাগ এবং সত্যিই স ত র্ক—যে কোনো বিষয়ে দরকার মতো ত র্ক ক'রে বুঝে নিতে রাজি যে ঠিক কোন কথার সঙ্গে কোন কথার সংগতি আছে বা নেই। এরকম সতর্ক আবহে পড়লে লোকে কথা বলার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হ'তে শেখে। একটা সত্যি কি মিথ্যের ওপর আর-দশটা সত্যি-মিথ্যে নির্ভর করে। একটা ভালো বা মন্দ আর-দশরকম ভালো-মন্দের জন্যে দায়ী। এই নির্ভরতার, এই দায়িত্বের বানান না শিখলে প্রকৃত সাক্ষরতা আসে না, র'য়ে যায় দেশজোড়া বদ্ধমূল গ্রাম্যতা। কৃষি কারখানা কারবারের জগতের মতোই সাধারণভাবে সত্যি-মিথ্যে কথা-বলার জগতেও 'কত ধানে কত চাল' শেখা ভয়ংকর রকমের জরুরী। এই শেখাটা আমাদের দেশসুদ্ধ সবাইকে শিখতে হবে। ভাষাবিজ্ঞানের অ আ ক খ এর অন্যতম পদক্ষেপমাত্র। ক্রমশ হয়তো শেখার এই সমবেত প্রয়াসে আমরা এমন কোনো নতুন ভূমিতে পৌঁছব যা এখনও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অজ্ঞাত। হয়তো আমাদের প্রাচীরবহুল দেশকেই পথিকৃতের ভূমিকা নিতে হবে। সেসব কথা পরে। ভাববিলাসে আর বাঙালী জাতির গৌরবচর্বণ ক'রে আর অগৌরব নিয়ে নাটকীয় বা বিদগ্ধ মনস্তাপ ক'রে অনেক দিন তো কাটল! সুনীতিবাবু যে কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলতেন সেইটাকে এবার চান্স দিয়ে দেখলে পারি, তাই না?

কথার ক্রিয়াকর্ম

টায়ে টোয়ে

শূন্য

একটার টা আর দুটোর টো। টায়ে টোয়ে সংসার চলে। টায়ের কাছে টো মাথা নিচু করে থাকে। এখন মাথা গোনার আমল। মাথার গুনতিতে টায়ের মেলা প্রতাপ। পাঁচটা ছটা সাতটা থেকে শুরু করে ১৭৩৮৭টা পর্যন্ত—তার চেয়েও দূরে—টায়ের দল ছড়িয়ে আছে। টোয়ের দল বলতে স্রেফ: দুটো। টোয়ের চেয়ে এমন-কি টেও মাথার গুনতিতে বড়: আড়াইটে তিনটে চারটে। সম্প্রতি ইলেকশন হয়ে গেছে কিনা। টে আর টোয়ের প্রায় সমস্ত সীট ঝরে গেছে। কিন্তু টায়ের উদার কক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে টে আর টো ভালো থাকে। ভালোই থাকে।

টা যে এরকম দরাজ দিল দেখিয়ে আশ্রয়-টাশ্রয় দিতে শিখেছে, এটা অবশ্য নতুন অভ্যেস। এখনো টা মোটামুটি রাস্তা দেখে চলে। গলা নিচু করে কথা বলে। বড় একটা অন্যদের সঙ্গে ভাব করে না।

চাইলে কি টা জমিয়ে বসতে পারত না বিভক্তিদের মহলে? য়ের বলে একজন বিভক্তি আছে। সে তো টা-কে বলেই রেখেছে, 'শুক্কুরবার সকালে আমি মালীর কাজ করতে যাই। সঙ্গে আসিস।' শুক্রবার য়ের যায় লম্বা-স্বরওয়ালা কথাদের লম্বাপনা ছেঁটে দিতে। যেমন, পা কথাটাতে য়ের জুড়ে যেতেই লম্বা পাআ হঠাৎ কম লম্বা হয়ে যায়, পাআয়ের হতে না পেরে পায়ের-এ পর্যবসিত হয়। কিন্তু টা এখনো নেমন্তন্ন শুনলেই না না বলে। তাই আপনি যখন বলেন, 'দাদাআ, পাআটা সরান', তখন পাআটা বলেন লম্বা পাআ লাগিয়ে। বুকের পাটা বলার মতন ছোট করে পাটা বলেন না। টা তো আর পোল দেশের খবর পায়নি, পাআ থেকে আ কাটবার সাহস তার আসবে কোত্থেকে।

টা আরো একটা হাতের নেমন্তন্ন সমানে পায়ে ঠেলছে। সেটা এসেছিল পরগাছাদের পাড়া থেকে। কুয়ো-টুয়োর টুয়ো, প্রেমের পরগাছা ট্রেম, এরা পরগাছাপাড়ার পঞ্চায়েতে জাঁকিয়ে বসবার পর ট-অক্ষরের সূত্রে জাতভাই যে টা সেই টা-কে লিখে পাঠিয়েছিল, 'শনিবার বিকেলে আমরা পাআ

চালিয়ে গিয়ে শাআ সাহেবের সঙ্গে চাআ খাই। ওরা লম্বা বলে আমরা রণপা ঝেপে নিয়ে লম্বা হয়ে নিই। বেশ লাগবে আসিস।' কিন্তু চাআ-টাআ খাওয়া নিয়ে একদম উৎসাহ নেই একলা চলনেওয়ালা টায়ের।

হতবুদ্ধি টা-কে এখনো কেউ দলে টানতে পারেনি বলেই আপনারা এখনো তিনভাবে বলতে বাধ্য হচ্ছেন 'বুকের পাটা', 'এই চাআটা খেয়ে নিন দাদা', 'চাআ-টাআ খাবো না আজ।' তবেই দেখুন, টায়ের আত্ম-বিশ্বাস কতটুকু। দলে ভিড়তে না পারা তো আত্মঅনাস্থারই প্রমাণ।

টায়ের এত ইতস্তত অথচ সে টো আর টে-কে পুষ্যি রেখেছে, এটা দেখে ভাষার বাবুশ্রেণী অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানীরা টা-কে একটা চাকরি দিয়েছেন। চাকরিটা কিন্তু স্ববিরোধী। টা-কে বলা হয়েছে, 'যা তুই দিনের বেলা নির্দেশক হ। কিন্তু রাত্তির বেলা বিশেষ্যের আগে বসিস এবং অনির্দিষ্ট হয়ে যাস।' ফলে 'লোকটা'র টা-কে বলে নির্দেশক। কিন্তু 'একটা লোক' বললে তো ম্যাকসিমাম অনির্দিষ্ট হয় ব্যাপারটা।

টা এ নিয়ে অনুযোগ করে মাঝে-মধ্যে। তার হাবভাব না-হয় বিড়ম্বিত। কিন্তু সে তো জানে যে সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে। বাবুরা এটা বুঝতে না-ও পারেন। কিন্তু ওঁরা অন্তত নিজেদের তৃপ্তির খাতিরেও তো একটা মনগড়া সোজা কাজ দেবেন টা-কে? তা না করে তাঁরা টায়ের বাইরের ইতস্তত দেখে অমনি সেটার নকলে টায়ের ঘোষিত চরিত্রেও কণ্ট্রাডিকশন এনে ফেললেন? টা পথ চেয়ে আছে, কবে ভাষাবাজ মানুষ একটুখানি কল্পনাশক্তি খরচ করে টা-কে তার বিড়ম্বনার কবল থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। তা হলে তাকে আর টো-টে-সহ দিনে এক কাজ রাত্রে তার উল্টো কাজ করতে হয় না।

এক

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী সব সময় তথ্যের গা ঘেঁষে জটিলতায় ভরপুর তত্ত্ব বানাতে ভালোবাসে না। সে মনে করে যে প্রকৃতির আর-সব মহলের মতোই ভাষাতেও নানারকম সরল তন্ত্রই রয়েছে। সে ধরে নেয় যে এই সরলতাগুলো কার্যত মিশে যাওয়ার ফলে বাস্তবে মাঝে মাঝে এমন ঘোঁট পাকিয়ে ওঠে যা এককেটা তন্ত্রের নিজের দোষ নয়। আশা করা যায় টায়ে-টোয়ে মিলে যে বিড়ম্বিত সংসারের গল্প শুনছিলাম তা সেই রকমই

বাস্তবের গোলমাল। তাত্ত্বিক কল্পনায় হয়তো কয়েকটা আলাদা-আলাদা সিধে রেখাচিত্র এঁকে টায়ের চরিত্রটা ধরতে পারব। হয়তো দেখা যাবে যে, একেকটা ছবি সত্যিই সাদাসিধে, কিন্তু অনেকগুলো ছবি বাস্তবে মিশে যাচ্ছে, তাই টা-কে দেখতে এরকম দ্বিধাগ্রস্ত।

একদিনেই পুরো রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে এমন আশা করা বাড়াবাড়ি। তবে এটুকু অন্তত ভাবতে পারি যে লোকে খেয়াল করবে প্রশ্নগুলো কী। দুয়েকটা জবাবও মিলবে বোধ হয়।

টা-টো-টে-কে একসঙ্গে টা-ই বলব। সংখ্যাগুরু বলে টা-ই তো ওই সংসারের মাথা। তা, এই টায়ের কী কাজ? জিগেস করলেই 'লোকটা দোকানটা' এইসব ভেবে অনেকে ফস করে উত্তর দেয়, টা হচ্ছে নির্দেশক, ইংরেজিতে যেমন দ্য। অর্থাৎ, দোকানের ইংরেজি শপ, দোকানটার ইংরেজি দ্য শপ।

এ জবাবটা কিন্তু একটুও ঠেলাঠেলি নিতে পারে না। একবারে বিশ্বাস না হয় চারবার ঠেলে দেখাচ্ছি।

প্রথম ঠেলা। ইংরেজিতে এ শপ নিশ্চয়ই অনির্দিষ্ট, কারণ এ-র কাজই তো অনির্দেশনা। এবার প্রশ্ন ওঠে, এ শপের বাংলা একটা দোকান কেন? টা এখানে কী করছে? জবাব নেই।

দ্বিতীয় ঠেলা। এই দোকান বা ওই দোকান বললে কথাটা নির্দিষ্ট হতে কিছু বাকি থাকে কি? থাকে না বোধ হয়। ইংরেজি দিস শপ বা দ্যাট শপকে তো ওর চেয়ে বেশি নির্দিষ্ট করা বারণ। দ্য দিস শপ বা দ্য দ্যাট শপ বলা অসম্ভব। বাংলায় তা হলে কিসের জোরে বলা চলে এই দোকানটা অথবা ওই দোকানটা? এ-সব জায়গায় টা বলে লাভ কী? ছায়া নিরুত্তর রহিল।

তৃতীয় ঠেলা। আচ্ছা, টা তো খালি একবচনে। দ্য শপের অনুবাদ দোকানটা। বহুবচনের নির্দেশক নাকি গুলো, যেমন দ্য শপ্‌সের সমার্থক দোকানগুলো। ঠিক তো? তা হলে বলুন, ফাইভ শপ্‌সের বাংলা কেন পাঁচটা দোকান? হবার কথা 'পাঁচগুলো দোকান', তাই নয় কি? ছায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

চতুর্থ ঠেলা। মরতে হুয়ে নির্দেশক কো এক ধক্কা ঔর দো। দুটো দোকান থেকে দোকান-দুটো আলাদা কিসে? তফাতটা তো এই যে

দোকান-দুটো নির্দিষ্ট, অর্থাৎ দ্য টু শপ্‌স, আর দুটো দোকান অনির্দিষ্ট, অর্থাৎ খালি টু শপ্‌স। এবার তো মনে হচ্ছে কে আগে কে পরে তাই দেখেই নির্দিষ্টতা ঠিক হচ্ছে। দোকান আগে বসলে নির্দিষ্ট, দুটো আগে বসলে অনির্দিষ্ট। টা-পরিবারের হয়ে টো হাজির আছে, দুটো দোকানেও যেমন দোকান-দুটোতেও তেমনি, নীরব নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। টা তাহলে আর যাই করুক, ঠিক নির্দিষ্টতা আনে না। নির্দিষ্টতা অন্য রাস্তায় আসে না কিংবা আসে। টা সে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। এবং হয়তো নিজের অন্য কাজ সারে।

কাজেই স্বীকার করা ভালো যে টায়ের চরিত্র নিয়ে ওই যে প্রচলিত অপবাদ ওটা ঠিক না। টা মোটেই নির্দেশক নয়। ইংরেজি দ্য শব্দের বাংলা অনুবাদ একবচনে টা এ ধারণা ভুল। আজকের কথাবার্তা থেকে আর কিছু যদি নাও মনে রাখেন, তবু এটুকু অন্তত মনে রাখবেন।

দুই

ইনদোনেশিয়ার জাতীয় ভাষা বাহাসা ইনডোনেসিআ। বাহাসায় লেজকে বলে একোর আর মানুষকে বলে ওরাঙ। পাঁচটা হাতি বলতে বাহাসা ইনডোনেসিআয় বলে লিমা একোর গাজাহ অর্থাৎ পাঁচ-লেজ হাতি। তিনজন মাস্টারের বাহাসা হচ্ছে তিগা ওরাঙ গুরু অর্থাৎ তিন-মানুষ মাস্টার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক জায়গায় এরকম দেখা যায়। গোনাগুনতির জন্যে সংখ্যা (তিগা ৩ অথবা লিমা ৫) আর তার পর ব্যাপারটার নাম (হাতি বা মাস্টার) যথেষ্ট নয়। কী ধরনের, কী জাতীয় ব্যাপার সেইটে বলবার জন্যে আরেকটা শব্দ লাগে, এমনিতে যার মানে লেজ বা মানুষ বা ওই গোছের একটা কিছু। গুনতে গিয়ে এদের সাহায্য লাগে বলে এই শব্দদের আমি বলব গণৎকার। 'তিন-মানুষ মাস্টার' আর 'পাঁচ-লেজ হাতি'তে 'মানুষ' আর 'লেজ' হচ্ছে গণৎকার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষায় গণৎকারের ছড়াছড়ি।

হিন্দীতে গণৎকারের দৌরাত্ম্য কম। পাঁচটা হাতির হিন্দী পাঁচ হাথী। তিনজন মাস্টারের হিন্দী তীন শিক্‌ষক। সংখ্যার ঠিক পরেই বিশেষ্য। হিন্দীতেও দুয়েক জায়গায় গণৎকার গোছের ব্যাপার নেই তা নয়। তবে সেগুলো দস্তুরমতো গণৎকার নয়। কাজেই সে কথা থাক।

অবভিয়াস ভৌগোলিক কারণে বাংলা ভাষাটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষা আর হিন্দীর মাঝামাঝি। বাহাসার মতো অমন রকমারি গণৎকার বাংলায় নেই। কোনো কোনো জায়গায় বিনা গণৎকারেও চলতে পারি আমরা, যেমন 'দুই দেশের মৈত্রী', 'সেখানে এক শেয়াল ছিল'। তবে সচরাচর বাংলা বাহাসারই মতো। তিগা ওরাঙ গুরুর বাংলা তিনজন মাস্টার। জন তো ওরাঙেরই মতো মনুষ্যবাচক গণৎকার। তেমনি লিমা একোর গাজাহের বাংলা পাঁচটা হাতি। টা এখানে একোরের অর্থাৎ লেজের তুলনীয় গণৎকার। পাঁচটা হাতি আর পাঁচজন হাতির তফাত কী? দুভাবে গোনা হচ্ছে। পাঁচজন হাতি বাচ্চাদের গল্পের চরিত্র। তারা মানুষের মতো। কথা বলতে পারে-টারে। পাঁচটা হাতি বলতে নরমাল হাতি বোঝায়।

টা তাহলে এই। জনের মতো গণৎকার। জন যেমন লোকগণনার, টা তেমনি মনুষ্যেতর গণনার দালাল। পাঁচজন ছেলেকে পাঁচটা ছেলে বললে তাদের মনুষ্যতা একটু কম বলে ধরা হয়। তাতে ছেলেরা তেমন আপত্তি করে না। নেতারা কিন্তু করে। অন্তত নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা তাই চট করে পাঁচটা নেতা বলি না ইচ্ছে করলেও। পাঁচজন নেতাই বলি।

ভারতের মাথায় পাহাড়। পায়ে সমুদ্র। টায়ের মাথার দিকে প্রতিবেশী যেমন জন, পায়ের দিকে তেমনি খানা। একটা মেঘ থেকে একখানা মেঘ আলাদা কিসে? দুটো চিঠির সঙ্গে দুখানা চিঠির তফাত কোথায়? তফাতের একটা দিক খেয়াল হয় যদি জেনে নিই খানা কোথায় অচল। দুখানা ছেলে বা চারখানা হাতি হয় না। তিনখানা মাছ শুনলেও আমরা থালার ওপর রাখা খাবারের কথাই ভাবি, পুকুরে সাঁতার দিচ্ছে যে মাছ তার কথা না ভেবে। টা বললে প্রাণীকেও বোঝাতে পারে। খানা বললে তা পারে না। টা বললে মানুষের থেকে যেটুকু প্রভেদ বোঝায়, খানা বললে তার চেয়ে অনেক বেশি দূরত্ব। এগুলো খুব মোটা দাগের তথ্য। এ ছাড়া টা আর খানার নানারকম সূক্ষ্ম তফাতের কথাও বলা যেতে পারে। বড় আর ছোট, সমগ্র আর খণ্ড, এই-সব তফাত মাখামাখি হয়ে আছে টা আর খানার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে টায়ের জ্ঞাতি টিও চলে আসবে। সূক্ষ্মতার খোঁজ আজকেই না নিলেও চলবে। টায়ের ঊর্ধ্বদেশে জন আর পাদদেশে খানা, এই দুই প্রতিবেশী রয়েছে। জন, টা, খানা—তিন গণৎকার। খবর এটাই।

পাদটীকা হয়ে আছে ছোটখাট সব গণৎকার। যেমন দুগাছা চুড়ির 'গাছা'। বত্রিশপাটি দাঁতের 'পাটি'। ওইরকম গণৎকার যদি আরো থাকত আর তাদের যদি দস্তুরমতো গুরুত্ব থাকত টা বা জনের মতন, তা হলে বাংলা অনেকটাই বাহাসা ইনডোনেসিআর অনুরূপ হতো। কিন্তু তেমন তো নয়। কাজেই ও-সব ঝামেলা সরিয়ে রেখে আপাতত টায়ের ব্যাপারই বুঝে নিই। এ পর্যন্ত জেনেছি : এক, টা নির্দেশক নয়। দুই, টা গণৎকার, জন আর খানার মতো।

তিন

টা আর খানার মিল দেখুন। দুটো চিঠি আর দু-খানা চিঠি একদিকে হেলে। চিঠি দুটো আর চিঠি দুখানা হেলে আরেকদিকে। হেলাহেলি লক্ষ করে প্রথম দফায় বলতে ইচ্ছে করে যে সংখ্যা আগে বসলে পদবন্ধ অনির্দিষ্ট, বিশেষ্য আগে বসলে নির্দিষ্ট। ব্যাপারটা কি ঠিক তাই? বলুন দেখি, 'এই চিঠি দুটো ডাকে দেব?' আর 'এই দুটো চিঠি ডাকে দেব?'-র মধ্যে তফাত কী? দুটো প্রশ্নই তো আঙুল দেখিয়ে করা যায়। কোন্ চিঠি-জোড়ার কথা হচ্ছে সেটা পুরোপুরি নির্দিষ্ট, দু জায়গাতেই। তবু কিছু তফাত রয়ে যায় বলে বোধ হতে পারে। সে বোধের কোনো কারণ দেখানো যায় কি?

জানবার জন্যে দুয়েকটা জিনিস পালটে দেখা ভালো। যেমন, সংখ্যাটা বদলে ফেলুন—২-এর বদলে ১১। এগারটা চিঠির বিকল্পে চিঠি-এগারটা বলতে গেলে আমরা হোঁচট খাই। সে হোঁচট কি এইজন্যে যে এগারটায় চার অক্ষর, দুটোয় দু অক্ষর? অক্ষর বলতে যদি দল বা সিলেবল বোঝায় তা হলে তো দশটাতেও দু অক্ষর। কিন্তু চিঠি-দশটা বলতেও অসুবিধে হয়। জিভে তা হলে আটকাচ্ছে না। আটকাচ্ছে মনে। অক্ষর বেশি বলে নয়; সংখ্যা হিসেবে ১১ ছোট নয় তাই। দুই-তিনের চেয়ে সংখ্যায় খানিকটা বড় হয়ে গেলেই সংখ্যা-পদটাকে 'চিঠি'র পরে বসানো বন্ধ করতে হয়। আটখানা চিঠিই বলতে হয়। চিঠি-আটখানা বলা যায় না।

খানা আর টা এব্যাপারে একই রকম। আটখানা চিঠি বা এগারখানা চিঠি ঠিক আছে। চিঠি-আটখানা বা চিঠি-এগারখানা বলতে বাধে। চিঠি-দু-খানা ছাড়িয়ে বেশি দূর যাওয়া যায় না।

কী নেই তা ছেড়ে দিয়ে কী আছে সেইদিক থেকে দেখলে, চিঠির আগে বসার বিকল্পে চিঠির পরে বসবার অধিকার ছোট সংখ্যারই আছে। দুটো-তিনটে, দুখানা-তিনখানা, এরাই বসতে পারে চিঠির লেজে—'চিঠি দুটো' ইত্যাদি। সংখ্যা-না-বলা ছোট সংখ্যা যে 'কয়' বা 'কয়েক' সে-ও শরীর সামলে অর্থাৎ ক হয়ে গিয়ে ওখানে বসে—চিঠি-কটা, চিঠি-কখানা।

এ থেকে কী মনে হয়? ছোট সংখ্যা যখন বিনয় করে চিঠির পরে বসে, তখন চিঠি ব্যাপারটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। সংখ্যাটুকু খালি পুনশ্চ। সে একটু খেয়াল করিয়ে দিচ্ছে, নেপথ্যে থেকে, চিঠির সংখ্যা যে অল্প এই কথাটা। এজন্যেই চিঠি এগারটা বলতে আটকায়। এগার বললে গোনা-গুনতির ব্যাপারটা বেশি বেশি নজর কাড়ে। আড়ালে রাখা মুশকিল। এগার-র মতো খবর পুনশ্চর খোপে মুখ গুঁজে থাকতে পারে না। দুই-তিনের মতো খুচরো খবর তা পারে। দরকার পড়লে।

দরকার কখন পড়ে? যখন 'এই চিঠি দুটো ডাকে দেবো?' বলার মতো অবস্থা। ও প্রশ্নটাতে 'এই'-শব্দের কাজ হচ্ছে দেখিয়ে দেওয়া। চিঠির দিকে যে এক্ষুনি, 'এই'-শব্দে, দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এই পূর্ব পরিচয়ের ব্যাপারটা মনে পড়ে যায় যখন চিঠির পরে অর্থাৎ তার চিঠিত্বের আড়ালে দুটো কথাটা শুনি। 'দুটো' তো এখানে দস্তুরমতো সংখ্যার ভূমিকায় হাজির নেই। 'এই দুটো চিঠি'তে শুনে বলা হচ্ছে কটা চিঠি। সংখ্যার ওপর সেখানে খানিকটা জোর দেওয়া হয় উচ্চারণে এবং অর্থবোধে। 'এই চিঠি-দুটো' বললে দাঁড়ায়—এই চিঠি, এবং ভালো কথা, যে চিঠির কথা হচ্ছে তার সংখ্যা দুই।

ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট টের পাওয়া যায় যখন সাধারণ ফেলা-ছড়ানো বাংলার ধরনে জিগেস করি, 'এই যে চিঠি, চিঠি-দুটো ডাকে দেব?' এ-রকম মেলে-ধরা প্রশ্নে চিঠির প্রথম আর দ্বিতীয় উল্লেখের মধ্যে তফাতটা শুনতেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উল্লেখে অর্থাৎ 'চিঠি-দুটো'তে যে অবান্তর লেজুড় হিসেবে সংখ্যাটা চলে আসছে, ওই ঘরোয়া ভঙ্গির মানে হল: শ্রোতা জানে কী চিঠির কথা হচ্ছে। এক্ষুনি তো 'এই যে চিঠি' বলে দেখিয়েছি।

প্রশ্নটা যখন সংক্ষেপে করি তখন 'এই যে চিঠি, চিঠি-দুটো ডাকে দেব?'-র আরম্ভটা ফাল হয়ে ঢুকে ছুঁচ হয়ে বেরোয়—'এই চিঠি-দুটো

ডাকে দেব ?’ অর্থাৎ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে যে ‘এই’-শব্দ, তার ভূমিকা খুলে-বলা প্রশ্নের ‘এই-যে-চিঠি’ অংশের মতন—প্রথম উল্লেখের ভূমিকা। আর, প্রশ্নটার ইনফ্লেটেড ডিফ্লেটেড দুই সংস্করণেই ‘চিঠি-দুটো’য় ওই ‘দুটো’ লেজুড়টার অন্যতম কাজ হলো মনে করিয়ে দেওয়া যে শ্রোতা অলরেডি জানে কী চিঠির কথা হচ্ছে। কিন্তু হয়তো জানা নেই কটা চিঠি আছে। তাই কথাচ্ছলে লেজুড় সেই অপ্রাসঙ্গিক বা আধাপ্রাসঙ্গিক খবরটাও জানিয়ে দিল। এবং, বাংলায় তাই নিয়ম বলে, সংখ্যার পাশে গণৎকারও হাজির—‘দুটো’ বা ‘দুখানা’।

প্রথম উল্লেখটা একই বাক্যে না থেকে আগের কোনো বাক্যে থাকতে পারে। বলতে পারি, চিঠি আছে দেখছি। চিঠি-দুটো ডাকে দেব ?

প্রথম উল্লেখের জন্যে কথাই বলতে হবে তাও নয়। ধরুন, চিঠির ওপর হাত রাখলাম। তারপর শ্রোতা খেয়াল করছে দেখে বললাম—চিঠি-দুটো ডাকে দেব ?

একটা রহস্যের কিছু অন্ধকার অন্তত সরলো। রহস্যটা ছিল, চিঠিটার টা যদি নির্দেশকের কাজ করে তা হলে ‘এই চিঠিটা’ বলা যাচ্ছে কেন ? ‘এই চিঠি’ই তো বেশ নির্দিষ্ট। এবার আমরা ‘এই-চিঠি-দুটো’ আর ‘চিঠি-দুটো’ তলিয়ে বুঝতে গিয়ে দেখেছি যে পুনশ্চস্থানীয় ‘দুটো’ আসলে নিজে নির্দেশক নয়। ওর একটা কাজ পূর্বনির্দেশের কথা মনে করিয়ে দেওয়া। সেই পূর্বনির্দেশ হয়তো পাওয়া গেছিল আকারে-ইঙ্গিতে, কিংবা আগের বাক্যে, অথবা ঠিক আগের ‘এই’-শব্দপ্রয়োগে।

বাংলার ভেতরে আনাগোনা করে এটুকু বোঝা যায়। চিঠিটার টা আর চিঠি-দুটোর দুটো তা হলে একই রকম। ইংরেজি দ্য কীরকম প্রাণী, দিস শপের বিকল্পে কেনই বা দ্য দিস শপ হয় না, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাক ইংরেজি ভাষার বিশারদেরা। চিঠিটা বা চিঠি-দুটোর মতোই দ্য লেটারের হাবভাব তা তো বলি নি। ইংরেজির বিষয়ে কোনো দাবি করছিই না। সেজন্যেই তো ওরকম চেঁচিয়ে জানিয়েছিলাম যে টা নির্দেশক নয়, দ্য-শব্দের বঙ্গীয় সংস্করণ নয়। সংস্কৃতর গর্ভ থেকে বেরতে-না-বেরতেই বাংলা-ভাষা-চিন্তাকে ইংরেজির কক্ষপথে আটকে যেতে দেওয়া উচিত হবে কি ?

চার

আবার চুম্বক লাগবে। টা নিয়ে তদন্ত করে এইটুকু বেরিয়েছে। এক—টা নির্দেশক নয়। দুই—জন বা খানার মতোই টা গণৎকার, কাজ করে সংখ্যা-শব্দের সঙ্গে যেমন একটা-দশটা-পাঁচটা। তিন—সংখ্যা যখন ছোট আর অপ্রধান তখন টা-ওয়ালা সংখ্যাপদ (দুটো, তিনটে, কটা) কথাচ্ছলে চলে আসতে পারে বিশেষ্যের পরে, যেমন চিঠি-তিনটে দোকান-দুটো। আলগা করে লাগানো ওই সংখ্যাপদ পূর্বনির্দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই জিনিসটা থেকে নির্দেশক নির্দেশক গন্ধ বেরতে পারে।

এই শেষের ব্যাপারটার সূত্রে আরো যা চোখে পড়ছে তা হলো 'চিঠি-দুটো'র সঙ্গে 'চিঠি-টা'র মিল। লক্ষ করুন। চিঠিটার টা এমন ব্যবহার করে যেন ওখানে আসলে সংখ্যাপদ আছে। যেন খালি 'টা' থাকার বদলে 'একটা' আছে ওখানে। দুটো চিঠির সঙ্গে চিঠি-দুটোর যা সম্পর্ক, একটা চিঠির সঙ্গে চিঠিটার সম্পর্কও তাই। আমরা তো চিঠি-একটা বা দোকান-একটা বলি না। তার বদলে বলি চিঠিটা, দোকানটা। এখানে 'এক' সংখ্যাটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

অদৃশ্য হতে চাইলে দোষ দেওয়া শক্ত। সংখ্যাপদ যে চিঠি-শব্দের আড়ালে চ'লে আসে তার কারণ সংখ্যাটা ছোট এবং খবরটা কম জরুরি। চিঠি-র ছায়ায় বসলে খানিকটা আব্রু হয়। অদৃশ্য দশা মানে তো ম্যাকসিমাম আড়াল।

চিঠিটা যেমন আসলে চিঠি-একটা, তেমনি চিঠিখানাও আসলে চিঠি-একখানা। চিঠিখানা আর চিঠিটার ভেতরে উহ্য 'এক' রয়েছে এরকম বলার যুক্তি কী কী ? প্রথম যুক্তি : টা আর খানার ছকের দাবি। দ্বিতীয় যুক্তি : জন-ছকের বিপরীত সায়। খুলে বলছি।

(ক) ছকের দাবি

ছক ব্যাপারটা জানেন তো ? এই দেখুন আমি-শব্দের ছক—

	প্রথমা	দ্বিতীয়া	ষষ্ঠী
এক	আমি	আমাকে	আমার
বহু	আমরা	আমাদের	আমাদের

এ তো গেল ছক বস্তুটির নমুনা। ছকের দাবি কাকে বলে তার উদাহরণ

দেখুন এবার। এসেছে এসেছির বদলে অনেকে প্রায়ই বলে, এসছে এসছি। তারা কিন্তু ভেসেছেকে ভেসছে বা ভালোবেসেছিকে ভালোবেসছি বলে না। ধরে নিন টালিনগর বলে একটা জায়গার বাসিন্দারা এসছে এসছির এমনই ভক্ত যে ভুলেও কখনো এসেছে বা এসেছি বলে না। অবশ্য আর সবার মতো তারাও ভেসেছে ভালোবেসেছে ইত্যাদি বলে থাকে। টালিনগরের বাংলায় এই যে ছক—

	আসা	ভাসা···
ঘটিত	এসছে	ভেসেছে···
ঘটমান	আসছে	ভাসছে···

—এই ছকের গড়ন দেখে বোঝা যায়, এসছেটা আসলে এসেছে। সয়ের এ-কার গা ঢাকা দেওয়াতে কথাটার চেহারা দাঁড়িয়েছে 'এসছে'। অর্থাৎ ছকের দাবি, বলতে হবে যে আসলে ওটা 'এসেছে', বিশেষ নিয়মে বা অনিয়মে তার বদলে এসছে বলা হয়, মাঝের এ-কারটাকে হাজতে পাঠিয়ে। তেমনি আরেকটা ছক দেখুন, টায়ের ছক—

	১	২···
আগে	একটা লোক	দুটো লোক···
পরে	লোকটা	লোক-দুটো···

শেষের লাইনে আমরা এমনিতে আশা করব 'লোক একটা'। কিন্তু ওরকম বলি না আমরা—ঠিক যেমন টালিনগরের লোকে এসছে-ই বলে, তাদের ভাষায় এসেছে-র চল নেই। কাজেই টায়ের ছকের দাবি—বলতে হবে যে শেষ ছত্রের ওই কথাটা 'লোক-একটা' হতে হতে ফসকে গেল, ওর 'এক' উড়ে গেল কোনো কারণে। খানার ছকও তাই চায়—

	১	২···
আগে	একখানা চিঠি	দুখানা চিঠি···
পরে	চিঠিখানা	চিঠি-দুখানা···

এই ছকের শেষ লাইনে 'চিঠি-একখানা' থাকলে ছক খুশি হতো। তা যখন নয় তখন ছকের দাবি, মানতে হবে যে ওখানে 'এক'-এর ভূত আছে।

(খ) বিপরীত সায়

টা-ছকের সঙ্গে খানা-ছক যেমনই গলা মেলালো, ওদের সঙ্গে জন-ছকের

তেমনই তফাত। কিন্তু এ তফাতটাও উহ্য একের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। জন-ছকটা এই রকম—

	১	২···
আগে	একজন ছেলে	দুজন ছেলে···
পরে	ছেলে—(এক) জন ?	ছেলে-দুজন ?···

'এই ছেলে-দুটোকে নিয়ে কি করি ?'-র সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন 'এই ছেলে-দুজনকে নিয়ে কী করি ?' শেষের বাক্যটা খুবই অদ্ভুত শুনতে। 'ছেলেজন' বা 'ছেলে-একজন'ও কোনোটাই বাংলা নয়। ('ছেলে-দুজন' কেউ কেউ অবশ্য বলেন ; তাঁদের বাঙলা আমার জানা বাঙলা থেকে অন্য ধরনের ; সেই বাঙলা নিয়ে তাঁরাই বিশদ করে লিখবেন।)

এবার যুক্তিটা বলি। লুপ্ত একের তত্ত্বে বলে, চিঠিখানা আসলে চিঠি-একখানা, চিঠিটা আসলে চিঠি-একটা। খানা বা টা-ওয়ালা ছোট সংখ্যাপদ লেজুড় হয়ে বসতে পারে। যখন বসে এবং সংখ্যাটা যখন 'এক' তখন 'এক' লোপ পায়। তাই মনে হয় সোজাসুজি টা বা খানাই বুঝি চিঠি-র গায়ে এঁটে বসল। এই তো লুপ্ত একের গল্প ? গল্পটা যদি সত্যিই হয় তা হলে প্রত্যাশা করব যে, যে-গণৎকারের সঙ্গে সংখ্যার বিশেষ্যের লেজুড় হয় না, সেই গণৎকার ওভাবে বিশেষ্যের গায়ে এঁটে বসার ভান করবে না। জন-গণৎকার তো স্বভাবে অ্যান্টি-লেজুড়, ছেলে-দুজন বা ছেলে-তিনজন শুনতে অস্বাভাবিক (অন্তত আমার কানে)। অতএব ছেলে-একজনের এক চ'লে গিয়ে 'ছেলেজন' তৈরি হওয়ার প্রশ্নই না ওঠার কথা।

তা, আমাদের প্রত্যাশা মিটেছে পুরোপুরি। 'ছেলেজন' সত্যিই হয়-না। ওই প্রত্যাশার মূলে ছিল ছেলেটা আর চিঠিখানার বেলায় লুপ্ত একের গল্পে বিশ্বাস। সে বিশ্বাসও এতে খানিকটা জোর পেল। দ্বিতীয় যুক্তির অবশ্য নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো মনোবল নেই। তবে ভাইস-ক্যাপটেনি দায়িত্ব নিতে ভালোই পারে।

পাঁচ

এত কাণ্ড করে অদৃশ্য একের কথাটা না-হয় প্রমাণিতই হলো। তাতে লাভ কী ? লাভ এই যে, 'বইটা' যদি আসলে 'বই-একটা' হয়, তা হলে তো টায়ের কাজের দোটানা চুকে গেল। টা তা হলে সারাক্ষণই গণৎকার

—খানা আর জনের আত্মীয়। 'বইটা'তেও টা নির্দেশক নয়; ওখানেও একটা লুকনো সংখ্যাই ধরে এনেছে টা-কে। নির্দেশকের ভাবটা কেন আসে তাও আন্দাজ করা যায় 'বই-দুটো', 'বই-দুখানা' ইত্যাদির পাশা-পাশি রেখে।

অবশ্য, এতে করে টায়ের সমস্ত মুশকিল আসান হয় এমন দাবি করছি না। যে ধরনের জায়গায় টা-ই বসে, খানা অকল্পনীয়, সেগুলোর ব্যাপার অন্য। যেমন, হচ্ছেটা কী? বাংলায় 'হচ্ছেখানা কী' বলা অসম্ভব। যাওয়াটা ঠিক হয়নিরও বিকল্প নেই। বলতে পারি না 'যাওয়াখানা ঠিক হয়নি।' যেটা কিছুটা খানিকটার বদলে যেখানা কিছুখানা খানিকখানা বলাও বাংলার স্বভাববিরুদ্ধ। এই-সমস্ত টা নিয়ে আজ কথা বলছি না। তার মানে এ নয় যে এগুলোর বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। বেশি জায়গা নেই বলেও বটে, কয়েকটা ব্যাপার এখনো সত্যিই অজানা বলেও, এখানেই ছেদ টানছি আপাতত।

আপনারা টাটোটে-পরিবারের মাথা টায়ের কাছ থেকে জেনে আসবেন, ওদের কাজের যে গোলমাল ছিল তার একটুও সুরাহা হলো কিনা। টায়ের যে কোথাও নির্দেশক কোথাও অনির্দেশক বলে আত্মপরিচয়ের দোটানা চলছে তার তো একটা বন্দোবস্ত দরকার। আজকের কথাবার্তায় সে প্রয়োজন খানিকটা মিটল আশা করি।

ছয়

এ নিবন্ধের রচনাকাল ১৯৮০। এবইয়ের আরো বেশ-কয়েকটা লেখার মতোই এটারও কোনো কোনো বক্তব্য আমি এখন আর মানি না অথবা পরিবর্তিত আকারে মানি। প্রত্যেক নিবন্ধের বেলায় একথা খুঁটিয়ে বলার দরকার দেখি নি। কিন্তু এই নিবন্ধের এক-লোপের তত্ত্ব যে আলোচনা-সাপেক্ষ এবং সম্ভবত ভুল, এটা বোধহয় খেয়াল করিয়ে দেওয়া ভাল। চিনিটা, তেলটা, বা জলটা—এইসব দৃষ্টান্তের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবেন, এক-লোপ আক্ষরিক অর্থে ঠিক বিশ্লেষণ হতে পারে না।

'ন্যাকা' শব্দের অর্থকথা

এক

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও ভাষ্য বা অনুষঙ্গ বোঝাতে 'অর্থকথা' শব্দটার প্রয়োগ পাওয়া যায়। সেকথা মনে রেখেই এই লেখার নামকরণ। অবশ্য নামটা আক্ষরিক অর্থে নিলেও দোষ হবে না। 'ন্যাকা' কথাটার যে মানে, সেই মানে নিয়ে কিছু বাক্যব্যয় : এই হলো **ন্যাকা** শব্দের অর্থকথা।

আধুনিক কথ্য বাঙলায় **ন্যাকা** শব্দটার বেশ চল আছে। আমরা সবাই বোধহয় জানি কথাটার মানে কী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আর-কোনো ভাষায়, যেমন ইংরেজিতে, এর সঠিক প্রতিশব্দ কেউ খুঁজে পেয়েছেন ব'লে শোনা যায় নি কখনো। ন্যাকামি করা কি তাহলে প্রত্যেকের জন্মসূত্রে পাওয়া মানবিক অধিকারের একটা নয়, বাঙালীদের একচেটে ? ব্যাপারটা আরও জটিল মনে হয় যখন দেখি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ **ন্যাকামি**-র এমন এক সংজ্ঞার্থ আদর্শ ব'লে মেনে নিচ্ছেন যার মধ্যে **ন্যাকা**-র বর্ণাঢ্য, নমনীয় অর্থ পুরো ধরা পড়েনি। **বালক** পত্রিকা চালানোর সময় রবীন্দ্রনাথ একবার পাঠকদের বলেছিলেন **ন্যাকামি** শব্দের ঠিক ঠিক সংজ্ঞার্থ লিখে পাঠাতে। জবাব অনেক এসেছিল। প্রতিযোগিতায় যিনি পুরস্কৃত হলেন তাঁর বয়ান ছিল 'ন্যাকামি বলিতে সাধারণত জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজার ভাব বুঝায়। যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না এই ভাবের নাম ন্যাকামি'। এতে **ন্যাকামি** শব্দের সমস্ত প্রয়োগের কথা ঠিকমত বলা হলো কিনা সে তর্ক নাহয় মুলতুবীই রইল। কিন্তু এই সংজ্ঞার্থে যাঁরা সন্তুষ্ট তাঁদেরও স্বীকার করা উচিত যে এমন কয়েক ব্যাপারে **ন্যাকা** শব্দটা চলে—অন্তত আজকাল চলে—যেখানে 'যেন কিছু জানে না' কথাটা অবান্তর। কবেকার কথা হচ্ছে তাতে কিছুটা এসে যায়। **বালক**-এর প্রতিযোগিতার পর উননব্বই বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে বাঙলা ভাষা কীভাবে বদলেছে তার স্পষ্ট নমুনা হাতের কাছেই। রবীন্দ্রনাথ বড়জোর পাঁচটি 'পদ'-এর মধ্যে সংজ্ঞার্থ লিখতে অনুরোধ করায় বেশিরভাগ প্রতিযোগী ভেবেছিলেন পাঁচটির বেশি

শব্দ ব্যবহার করা চলবে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চেয়েছিলেন অনধিক পাঁচ বাক্যের সংজ্ঞার্থ। সেকথা উনি খোলসা ক'রে ব'লে না দিলে আমরাও 'পদ' বলতে শব্দই বুঝতাম।

ধরুন, এক ভদ্রমহিলা শহরের বাইরে শনি-রবিবার কাটিয়ে ফিরে এসে দেখলেন ওঁর টবের বোগেনভেলিয়া দুদিন জল না পেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। অন্য কারণে বিরক্ত ছিলেন ভদ্রমহিলা, ব'কে উঠলেন : 'মহা ন্যাকা। দুদিন জল পায়নি তাতেই ন্যেতিয়ে পড়েছে!' 'ন্যেতিয়ে' কথাটা এমন মুখ বেঁকিয়ে বললেন, উদ্ভিদের মন থাকলে কেঁদেই ফেলত বুঝি। কিন্তু সত্যি তো আর বোগেনভেলিয়ার মন নেই, তার পক্ষে 'জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজা'র প্রশ্ন উঠে না, আর সত্যি বলতে 'গাছটার **ন্যাকামি** দেখলে গা জলে যায়' বললে এখানে স্বাভাবিক শোনাত কিনা আমি খুব নিশ্চিত নই। কিন্তু বলুন, 'মহা ন্যাকা' কি সংগত শোনাচ্ছে না এখানে? কাজেই খুঁজে দেখলে হয়, ন্যাকা শব্দের ভাল একটা রবীন্দ্রোত্তর সংজ্ঞার্থ আমরা ভেবে পাই কিনা। এটা এ প্রবন্ধের প্রথম অভিপ্রায়।

সে চেষ্টা করতে গেলেই, অনিবার্যভাবে, সামাজিক মনোভাবের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কারণ, ন্যাকা কথাটার মধ্যে একটা বিরক্তি কিংবা অবজ্ঞা উহ্য থাকেই। কেউ কারুর পিছনে লাগতে না চাইলে 'ন্যাকা' বলবে না। কাকে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে, কোন চরিত্রলক্ষণ সমাজে কার কাছে অসহ্য ঠেকল, এসব ব্যাপারে একেবারে কিছু না বললে **ন্যাকা** অথবা **চালিয়াত পাকা ইয়ার আহ্লাদী**-র মতো নিন্দার্থক শব্দের অর্থনির্দেশ অসমাপ্ত রয়ে যায়।

দুই

ধ'রে নেওয়া যাক, স্লেট খালি, কিছুই সাব্যস্ত করেননি রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কেউ। গোড়া থেকে শুরু করি। ন্যাকা মানে কী? দুটো পরোক্ষ প্রশ্ন জুড়ে দিই এই সঙ্গে : ন্যাকার উলটো কী? আর, ইংরেজি কী?

অনেকে বলেন, ন্যাকা-র ইংরেজি হয় না। অল্প কিছু অনুসন্ধান চালিয়ে মনে হয়েছে, কথাটার উলটো ঠিক কী সে বিষয়েও স্পষ্ট ঐকমত্য নেই। এই দু'রকম অনির্দেশ্যতার কারণ বোধহয় একই। ন্যাকা-র অর্থের অনেকগুলো দিক আছে। সব কটা দিক কোন একটা ইংরেজি শব্দে ধ'রে দেওয়া

কঠিন। সব দিক থেকে বিপরীতার্থক কোন একটা বাঙলা শব্দও খুঁজে পেতে দেরী হয়। আমরা তাই একেকটা দিক ধ'রে আস্তে আস্তে অগ্রসর হব।

টবের বোগেনভেলিয়ার দৃষ্টান্তেই ফিরে আসি। এটা ঠিক যে গাছ বা লতাকে চালাক, চালবাজ কিংবা রাগী কেউই বলে না। অর্থাৎ বোগেন-ভেলিয়াদের সচরাচর মানবিক ব'লে ভাবি না আমরা। তবু উদ্ভিদের যখন নাম রাখি লজ্জাবতী, অথবা ওই ভদ্রমহিলা যখন লতার দুর্বলতা দেখে 'মহা ন্যাকা' ব'লে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কোনো একটা স্তরে তখন উদ্ভিদকে মানুষের সঙ্গে এক করেই দেখা হচ্ছে, তাই নয় কি? মানুষের বেলায় আমরা যেসব কথা বলি তার কয়েকটা[১] উদ্ভিদের বেলাতেও চলে, যেমন 'দুর্বল ঋজু ন্যাকা লাজুক নম্র সুন্দর বেঢপ বুড়ো অসুস্থ', এমনকি 'আশ্রিত আশ্রিত-বৎসল'। আর চালাক বোকা কুটিল রাগী বোবা প্লেফুল ডিপ্রেস্‌ড-এর মতো কিছু শব্দ আছে যেগুলো মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারের প্রসঙ্গে স্বাভাবিক শোনায়, কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে নিতান্তই বেমানান।

'যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বোঝে না এই ভাবের' অতিরিক্ত একটা উপাদান সনাক্ত করা সহজ হবে এবার, 'অনুভবের' উপাদান।

জ্ঞান অজ্ঞান, বোধ নির্বোধ এগুলো আমাদের মানচিত্রে ভাষার 'সক্রিয় আর জঙ্গম' বৃত্তির দিকের কথা। কাজেই বোঝা-ই যায় কেন এ অর্থে **ন্যাকামি**-র সঙ্গে বোগেনভেলিয়ার স্বাভাবিক সংস্রব কল্পনা করা মুশকিল। **ন্যাকা** শব্দের যে 'সুকুমার' অর্থ এখানে সংগত ('একটুতেই কাত হয়ে, কাহিল হয়ে পড়ে'), সে অর্থে ন্যাকা-র বিপরীত 'সংহত দৃঢ় সহশীল শক্ত রোবাস্ট স্টার্ডি' আর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'টেণ্ডার ডেলিকেট ফ্রাজাইল', আর হয়ত 'ডেন্টি' (কিংবা ডেন্টি লিট্‌ল থিং)।

কেউ কেউ বলবেন এ অর্থে অনেক লাগসই, সমার্থক শব্দ 'স্পর্শকাতর'। নেহাত ভুল নয় কথাটা। 'স্পর্শ করলেই যে কাতর হয়ে পড়ে', এই ঈষৎ নিন্দাসূচক আক্ষরিক অর্থ, সত্যিই, ন্যাকা-র 'অনুভবের' অর্থের সঙ্গে অনেকটা মেলে। কিন্তু, ওই আক্ষরিক অর্থ থেকে স্পর্শকাতর প্রায়ই একটু দূরে স'রে যায়। কথাটার মানে দাঁড়ায় তখন, 'একটুখানি স্পর্শ করলেই যে (১) বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেয় (২) কোনো-না-কোনোভাবে সাড়া দেয় (৩) টের পেয়েছে সেকথা বুঝতে দেয় (৪) টের পায় (৫) সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে'। ডেলিকেট আর সেনসিটিভ-এর মতো এখানেও দেখি, এমনিতে

'স্পর্শকাতর' নিন্দে বা প্রশংসা কোনটাই নয়, আবার দুটোই বোঝাতে পারে কিন্তু প্রায়ই প্রশংসার্থে ব্যবহার হয়। 'ভেরি সেনসিটিভ পার্সন, ডেলিকেট ইনস্ট্রুমেণ্ট, সেনসিটিভ ইনস্ট্রুমেণ্ট—এধরনের কথা আপনি যদি স্বাভাবিক স্বরে বলেন, সবাই ধ'রে নেবে প্রশংসা করছেন। বিরক্তি প্রকাশ করতে চাইলে বেশ বিরক্ত স্বরে বলতে হবে আপনাকে কথাটা। এদিকে, 'ন্যাকা' স্বভাবত বিরক্তিসূচক শব্দ। নিরপেক্ষ অর্থেই কথাটা বলা চলে না, প্রশংসা তো দূরের কথা। স্পর্শকাতর-এর সঙ্গে ন্যাকার সমীকরণ তাই মানতে পারা যায় না। তবে আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।

স্পর্শকাতর আর ন্যাকা-র অর্থসাদৃশ্য থাকলেও যেমন পুরোপুরি এক ক'রে দেখলে ভুল হবে, তেমনি 'অসহিষ্ণু' কথাটার সঙ্গেও ন্যাকা-র বেশ মিল আছে, তা সত্ত্বেও ব্যবধান রয়ে যায়। এই মিল আর এই ব্যবধানের নিশানা ধ'রে আরো খানিক দূর এগোতে পারি। ন্যাকা-র যে বিশেষ অর্থে তার বিপরীতার্থক শব্দ **সহ্যশীল**, সেখানেই অসহিষ্ণু-র সঙ্গে তার সম্বন্ধ। যে ন্যাকা, একটুতেই সে নেতিয়ে পড়ে ; চাপ সইতে, কষ্ট নিতে পারে না তার মৃদু প্রকৃতি। যে অসহিষ্ণু সে অল্পেই বিগড়ে যায় ; ধৈর্য, ক্ষমা তার স্বভাবে নেই, মেজাজ তার সপ্তমে চ'ড়েই আছে। 'সহ্য করতে পারে না' এ কথাটা ন্যাকা অসহিষ্ণু দুয়ের বেলাতেই বলা চলে। তফাত এইখানে, ন্যাকা কষ্ট নিতে পারে না জোর নেই ব'লে, আর ধৈর্য নেই ব'লে অসহিষ্ণু সইতে পারে না সামান্যতম উপদ্রব।

কিন্তু ধরুন, ডিকশনারির ওজন নিতে না পেরে একটা বইয়ের তাক মচমচ ক'রে ভেঙে গেল। তাকে কোনো অলংকারেই ন্যাকা বলবেন কি? এখানে তো নির্লিপ্তভাবে বলার কথা 'পলকা' নয়ত 'ভঙ্গুর'। দ্রব্য হিসেবে কোন কিছুর সামগ্রীগত দোষ গুণ বিচারের সময় **পলকা** বলতে পারি। ব্যক্তি কিংবা জীব হিসেবে কারুর ব্যবহারের ভঙ্গী বিষয়েই **ন্যাকা** শব্দটা প্রযোজ্য।

তিন

ন্যাকা-র শব্দার্থের একটা দিক তাহলে এই। মানুষের, যে-কোনো জীবের আচরণে অতিরিক্ত মৃদু স্পর্শকাতরতা দেখা দিলে সে সম্বন্ধে ক্ষোভ বোঝাতেই কথাটার ব্যবহার।

অতিরিক্ত, ক্ষোভ। মানে, কতটা মৃদু হওয়া সমীচীন, কতটা স্পর্শ-

কাতরতা দেখানো অশোভন হবে না সে বিষয়ে কথাটা যে বলছে তার মনে মনে একটা মাত্রা ঠিক করা আছে। কারুর আচরণ সেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ব'লেই তার আপত্তি, 'ন্যাকা' শব্দে যে আপত্তির সার্থক প্রকাশ। 'সার্থক' কেন ? প্রথমত, স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করার সঙ্গে বাঙলায় 'অ্যা' ধ্বনির অন্তরঙ্গ যোগ আরো অনেক ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। ন্যাকান্যাকা-র পাশাপাশি দেখতে পাই নানা ধরনের আতিশয্যসূচক শব্দ : ঘ্যানরঘ্যানর, খ্যানখ্যান, 'প্যানপেনে আধুনিক গান', ক্যাটকেটে, ঢ্যাঙা, (কাউকে মুগ্ধ হয়ে বলতে শুনেছেন কখনো 'ভদ্রলোক দারুণ ঢ্যাঙা' ? প্রশংসায়, শ্রদ্ধায় 'লম্বা'ই বলে)। আর দ্বিতীয় কথা, 'ন্যাকা' বলার সঙ্গে ভেঙানো-র যোগ খুব স্পষ্ট। ধ্বনিতেও দেখুন, দুটো শব্দেই 'অ্যা' আর নাসিক্য ধ্বনি আছে ; আর 'ন্যাকা' কথাটা প্রায়ই বিকৃত স্বরে উচ্চারণ হয় ; তাছাড়া, 'ন্যাকা-ন্যাকা কথার ঢঙ' অনুকরণের সময় কখনো কখনো 'আ'র জায়গায় 'অ্যা' বসে, যেমন 'না'র বদাল 'ন্যা'। লোকের পিছনে লাগার জন্য যে সমৃদ্ধ সামাজিক টেক্‌নলজি বাঙালীরা উদ্ভাবন করেছেন, তার একাধিক সফিস্টিকে-টেড টেকনিকের ব্যবহার দেখতে পাই 'ন্যাকা' কথাটার গঠনে। ধ্বনি আর অর্থের তাই এমন সামঞ্জস্য।

এই এক সুর, একই মেজাজের শব্দ **ঢঙ** আর **আদিখ্যেতা**। শোভন স্বাভাবিকতার-মাত্রা-পেরিয়ে-যাওয়া কারুর ব্যবহারে আপত্তি এখানেও খুব স্পষ্ট (অ্যা ধ্বনি যদিও নেই)। ন্যাকা-র যে বিশেষ অর্থে আদিখ্যেতা আর ঢঙের কথাই বড় হয়ে ওঠে সেখানে তার সঙ্গে ইংরেজি 'অ্যাফেকটেড' আর 'পুটিং অন এয়ার্স'-এর সম্পর্ক। ন্যাকার-র বিপরীত তখন **স্বাভাবিক**। মৃদু কোমল স্বভাবের কথাটা গৌণ হয়ে যায় এপ্রসঙ্গে, চলনে বলনে বিকৃতির ব্যাপরটাই সব ছাপিয়ে আসল হয়ে ওঠে। সহজেই তার অপ্রধান অর্থের রঙ বদলে যায়।

এটা লক্ষ করবার বিষয় যে ন্যাকা-র প্রথম থেকে দ্বিতীয় অনুষঙ্গের দিকে স'রে যাওয়ার সময় তিনটে জিনিষ ধ'রে নিতে হয়। ধ'রে নিতে হয়, 'ন্যাকা' যাকে বলা হচ্ছে তার ওই ব্যবহার (১) সচেতন (মাত্রাজ্ঞান সত্ত্বেও মাত্রালঙ্ঘন), (২) অভিপ্রেত (মাত্রাবোধ-সংগত ব্যবহার করতে পারে তবু করছে না)। আর স্বভাবতই ধ'রে নেওয়া দরকার যে ব্যবহারে মাত্রাবোধ নিছক বক্তার রুচির ব্যাপার নয়, ব্যবহারে স্বাভাবিকতার সীমা কোনখানে

সেটা নিজে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, স্বতন্ত্র ; রুচির উর্ধ্বে তার স্থান। এসব কথা ধ'রে না নিলে 'ন্যাকা'য় শুধু বিরক্তি অবজ্ঞাই প্রকাশ পায় ; ধ'রে নিতেই নালিশের স্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুটোই নিন্দে। কিন্তু প্রথমটা যেন 'বোকা', 'ছেলেমানুষ' বলার মতো, 'দুর তুই একদম রোদ নিতে পারিস না, দিলি তো পিকনিক মাটি ক'রে!' ('কিন্তু কী আর করা, ও ওই রকমই, আমাদেরই ভুল হয়েছে ওকে আসতে বলা')। আর দ্বিতীয় অর্থে 'ন্যাকা' যেন 'জেনেশুনে ন্যাকামি করার দায়ে' অভিযোগ : 'এরকম ন্যাকামি করার কোনো মানে হয়?' 'আসামি'র উপর এখানে ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরোপ করা হচ্ছে তার ব্যবহারের জন্য, তার 'শুভবুদ্ধি'র কাছেই 'বাদীপক্ষে'র আবেদন।

ন্যাকা-র প্রথম প্রয়োগের কথাটা যেন 'কী ভালো হতো যদি তুমি অন্য-রকম হতে', আর দ্বিতীয় প্রয়োগে যেন বলা হচ্ছে 'এরকম না করলেও তো পারো'।

চার

নারী আর শিশুরা স্বভাবত যে ধরনের ব্যবহার করে, সাবালক পুরুষ মানুষের তা শোভা পায় না। প্রাপ্তবয়স্কর শিশুসুলভ আচরণ দেখলে, কিংবা যেকোনো বয়সের ছেলে যদি মেয়েদের মতো ব্যবহার করে, অনেকেই ন্যাকা বলবে। এই তৃতীয় প্রয়োগের সঙ্গে ন্যাকা-র অন্য সব মানের সম্পর্ক স্পষ্ট : মৃদু স্পর্শকাতরতা সচরাচর কম দেখা যায় বয়স্ক পুরুষ মহলে। এই 'ন্যাকা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ বোধহয় **স্কিটিশ** (বিহেভিং লাইক এ স্কিট) আর বিপরীতার্থক শব্দ হয় পুরুষালি **পুরুষালি** (ইংরেজিতে আরও সুষ্ঠু : ম্যাস্কিউলিন, ভিগরাস)।

তৃতীয় অর্থে ন্যাকা-র সঙ্গে 'ছেলেমানুষি' আর 'মেয়েলিপনা'র সবচেয়ে বড় তফাত, ন্যাকা বললে বিকৃত রুচির উপর জোর দেওয়া হয়। 'ছেলে-মানুষি' তো স্নেহের সঙ্গে বলা, ছেলেমানুষের ব্যবহার নিতান্তই সরল ; আর মেয়েলিপনা মানে বিশেষ ক'রে সামান্য তুচ্ছতার দিকে ঝোঁক। ইংরেজি এফেমিনেট মানে কিন্তু মেয়েলি নয়, ন্যাকা!

নারী আর শিশুদের একটা মিল, পরিণত বয়সের পুরুষদের চেয়ে বেশি সহজে ওদের চোখে জল আসে। এদিকটায় যদি ঝোঁক পড়ে, ন্যাকা-র

ইংরেজি soppy। অতি রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাসে যদি মুনসীয়ানার অভাব থাকে, কেউ কেউ তাকে সপি বলবেন (কিংবা ধরুন যাকে অনেকে বোম্বাই ছবি বলেন [মাদ্রাজেও কিছু তৈরি হয়] সেগুলোর কাহিনী প্রায়ই 'ন্যাকান্যাকা' আর 'সপি')। আরেকটু শিষ্ট সমার্থক শব্দ **সেন্টিমেন্টাল**। এটা তাহলে ন্যাকা-র চার নম্বর ভূমিকা। এই 'ন্যাকা' বলা চলে শিল্প-কর্মের বেলাতেই, কারুর ব্যবহার নিয়ে নয়। তৃতীয় অর্থের সঙ্গে চতুর্থের যোগ চোখের জলের ধারায় : কোনো কোনো সিনেমা নাটক দেখলে বয়স্ক পুরুষদেরও কান্না পায়। দ্বিতীয় প্রয়োগে যেমন, নালিশের স্বর এ দুই অর্থেও তেমনি স্পষ্ট।

চতুর্থ প্রয়োগে 'ন্যাকা'-র উলটো কী? কাউকে 'কাটখোট্টা' বললে উলটো নিন্দেটা করা হয়। ন্যাকা-ন্যাকা শিল্পের দোষ যেমন আবেগের বাড়াবাড়ি, কাটখোট্টা লোকের আবার তেমনি রসকষের বালাই নেই আদৌ। কিন্তু কোনো গান অথবা কবিতা 'ন্যাকা নয়, ঠিক উলটো' বলতে চাইলে কী বলব? রচনায় সংযমের নীচে আবেগ অনেকটা ঢাকা পড়েছে, এই বলব, ব্যবহার করব ক্লাসিসিস্টদের প্রিয় কোনো শব্দ—সংযত সাবডিউড বিদগ্ধ ঋজু? না, অতি রোমান্টিকতার আতিশয্য বাদ দিয়ে খাঁটি রোমান্টিক আন্তরিকতার মহিমাই বড় ক'রে দেখব—জেন্যুইন, অথেন্টিক, ট্রুলি মুভিং? নাকি, বিশেষ শিল্পাদর্শের দিকে না ঝুঁকে জোর দেবো বিকৃতিহীন শিল্পবোধের উপর—আর্টিষ্টিক এসথেটিক জাতীয় নিরপেক্ষ শব্দের আশ্রয় নিয়ে? তিনটে বিকল্পের একটারও উত্তরে 'না' বলার যুক্তি দেখছি না। ঠিক ক'রে কিছু বলা মুশকিল।

'ন্যাকান্যাকা গদ্য' কথাটা লক্ষ করলে অতটা আর দিশেহারা লাগে না। কারুর গদ্যরীতি নিয়ে এ মন্তব্যের মর্ম হল 'ন্যাও, আর কাব্যি করতে হবে না, কী বলতে চাইছ স্পষ্ট ক'রে গুছিয়ে ব'লে ফ্যালো'। গদ্যকে দেখা হয় প্রধানত শিল্পের নয়, বক্তব্যের বাহন হিসেবে। যে লেখায় দরকারি কথা ঠিকমতো বলার প্রয়োজন ছাপিয়ে সুন্দর রীতিতে গাঁথার তাগিদটাই জরুরি হয়ে উঠেছে সে গদ্যই অনেকের দৃষ্টিতে 'কাব্যিকাব্যি, ন্যাকান্যাকা'। 'গয়নার' বাহুল্য, প্রসাধনবিলাস—গদ্যে ন্যাকামির এ-ই লক্ষণ। লেখায় শ্রী আনবার প্রয়াস একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে পর সৌষ্ঠব সুষমা আর সঞ্চারিত হয় না, উলটে আড়ষ্টতা কিংবা আর্দ্রতা নষ্ট ক'রে দেয় সমস্ত প্রসাদগুণ, স্টাইল নেমে আসে ম্যানারিজমের পর্যায়ে।

চার নম্বর 'ন্যাকা'-র অভিযোগের ধরন এবার কতকটা ধরতে পারছি। কিন্তু এ অর্থে কথাটা কেবল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব'লে তো ভুল করেছিলাম তাহলে। বরঞ্চ এখানেও দৈনন্দিন ভাষায়, বিনোদনে 'শিল্পের' উগ্রললিত, উদ্‌বেল, উপস্থিতি নিয়েই নালিশ। সৌন্দর্য সঞ্চারের যে চেষ্টা শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, চোখে লাগে, সেটাই আপত্তির বিষয়। ('বেশির ভাগ কবিই ন্যাকা' এই প্রবাদের মূলে যে সত্যটা আছে তা হ'লো এই : কবিযশঃপ্রার্থী অনেকেই স্বভাবত খাঁটি সংবেদনশীল মানুষ নন অথচ সেরকম হ'তে চান, তেমন হবার চেষ্টা করেন। তার ফলে কোনো কোনো বিখ্যাত কবির বাইরের চালচলন-বৈশিষ্ট্যের অতিরঞ্জিত অনুকরণের শৌখিনতায় তাঁদের পেয়ে বসে।)

সংবেদনশীল সেনসিটিভ স্পর্শকাতর ডেলিকেট ফেমিনিন—এই সমগ্র স্বরগ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখলে বুঝতে পারি, দুর্বলতা আর নারীত্বের সঙ্গে শিল্প অনুভূতির কোথায় যোগ। এখানেই 'ন্যাকা'র সমস্ত মানে এক জায়গায় এসে মেলে, ভিন্ন ভিন্ন নালিশের উপচ্ছায়া মিশে যায় অভিন্ন এক ন্যাকামি-বিরোধী মোর্চার পতাকার ছায়ায়। কোন শরীরের এই ছায়া ? মামলা কীসের, কে ফরিয়াদী, কীসের দায়ে কে-ই বা অভিযুক্ত ?

চট ক'রে উত্তর দিতে গিয়ে কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বেশির ভাগ সংস্কৃতির সমাজব্যবস্থা পুরুষশাসিত ; নারী আর শিশুরা শোষিত ব'লেই তাদের হেয় ক'রে দেখা হয়ে আসছে ; নারী, শিশু আর সেইসব শিল্পী সাহিত্যিক যারা এদের নৈতিক সমর্থন দিয়ে এসেছে—সমাজেই এই তিন উপাদানের সঙ্গে পুরুষের অনেকদিনের দ্বন্দ্বই 'ন্যাকা'র মতো শব্দে প্রতিফলিত। এ বিশ্লেষণের একটা মুশকিল এই যে ভাষার রাজ্যে সমাজপতিদের নিয়ন্ত্রণ একচেটে নয়, শব্দপ্রয়োগের উপর সাহিত্যিক শিল্পী মানুষের প্রভাব কিছুমাত্র কম নয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ; কাজেই সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ব'লে ধ'রে নিলে ভাষার কোনো কিছুরই পুরো ব্যাখ্যা হয় না। এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য একটা বিশ্লেষণের রূপরেখা ছ'কে দিয়ে লেখা শেষ করছি।

ন্যাকা-র প্রথম থেকে দ্বিতীয় অর্থে স'রে যাওয়ার সময় তিনটে জিনিষ ধ'রে নেওয়া দরকার বলেছিলাম। আরেকটু সাধারণভাবে বলি এবার। (১) শোভনতার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, সেই মাত্রা-ছাড়িয়ে-

যাওয়া আচরণভঙ্গী (অথবা রচনারীতি) 'ন্যাকান্যাকা'। (২) এরকম ব্যবহার যে করে সে নিশ্চয়ই জানে সে তাল কাটছে। (৩) তাল যে জ্ঞাতসারে কাটছে সে নিশ্চয়ই ইচ্ছে করলেই না-ও কাটতে পারত তাল। ন্যাকা-র দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রয়োগে যে নালিশের স্থর স্পষ্ট, এই তিনটে কথাই সেই অভিযোগের অন্তঃসার। (তিনরকম প্রয়োগের মধ্যে তফাত খালি নালিশটার ক্ষেত্র নিয়ে।) একে একে এই ধারণা-তিনটের মূলে কী আছে খোঁজ নিলে 'ন্যাকা' শব্দের মানবিক পটভূমি খানিকটা দেখতে পাবো আমরা।

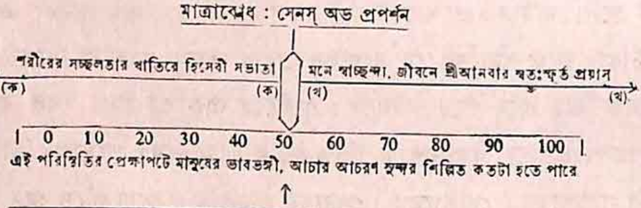
পাঁচ

শোভনতা কাকে বলে ? স্থন্দর আর শোভন এক নয় কিন্তু।

মানুষের সমস্ত আচরণের পিছনে যেসব তাগিদ ক্রিয়াশীল, তার মধ্যে অন্তত দুটো গোত্র সনাক্ত করা যায়। (ক) প্র্যাকটিকাল তাগিদ কিছু, আর আছে (খ) মনের তৃষ্ণা। (ক) আরামের সঙ্গে আহারনিদ্রামৈথুন এই হলো মোটামুটি প্রত্যেকের শরীরের বুনিয়াদী জাগতিক চাহিদা, এগুলো মেটাবার জন্যে সমাজের যে সংগঠিত প্রয়াস তাতে অংশ না নিলেই নয়। অনেক কিছু এসে পড়ে এইসঙ্গে : বাইরের প্রকৃতির উপর দখল কায়েম করার অভিপ্রায়ে বিজ্ঞানশাস্ত্র রচিত হয়, নানা মানুষের প্রয়োজন (চাহিদা) আর পরিশ্রমের (যোগানের) লেনদেন সামলাবার জন্যে গ'ড়ে ওঠে অজস্র ছোটবড় প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে (খ) মানুষের আবেগ আর অনুভূতির প্রবণতা প্রাথমিক হিসেবের ধার ধারে না। এমন অসংখ্য তুচ্ছ উদ্দীপনে মন খুশি হয়ে ওঠে, আকৃষ্ট বোধ করে যাতে শরীরের কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ ফায়দা নেই। ব্যবহারিক কাজের অর্থে অকেজো এক সহজাত সৌন্দর্যপ্রেম আমাদের দিয়ে অনাবশ্যক কত কী করিয়ে নেয়। মানুষের অনেক ভাল-বাসায় বিরাগে স্বার্থের ব্যাপার জড়িয়ে থাকে ঠিকই, তবে সবটাই স্বার্থের প্রতিফলন নয় : অতিরিক্ত যেটুকু, তার পিছনে থাকে বেহিসেবী বোধ। দরকার না থাকলেও অনেকে প্রত্যেক মুহূর্ত স্থন্দর ক'রে বাঁচতে চায়, স্থন্দর বলতে তারা যা বোঝে সেইভাবে ; অল্পবিস্তর চেষ্টাও করে সেভাবে বাঁচতে ; এ সাধনায় প্র্যাকটিকাল তাগিদ যখন বাদ সাধে তখনই ট্র্যাজেডি। এ-রকম ট্র্যাজেডি এড়িয়ে চলে লোকে, আত্মসমর্পণ করে ব্যবহারিক প্রয়োজনের

কাছে, আবেগ অনুভূতিকে সামান্যই প্রশ্রয় দেয়। (সংসারের প্রকাশ্য কর্মচক্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরাই সবচেয়ে বেশি নির্মমভাবে জড়িত থাকে, তাদের স্বভাবে সংবেদন সেজন্য বিকাশের সুযোগ পায় সবচেয়ে কম। 'ন্যাকা'র তৃতীয় অনুষঙ্গের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এ কথা।) মানুষের সেনসিটিভিটি আর ফেল-কড়ি-মাখ-তেল-সমাজের প্র্যাকটিকালিটির মধ্যে যে নিত্য ডায়ালেকটিক, এটাই তার সাধারণ ছবি।

হৃদয়কে প্রশ্রয় না দেওয়া মানে রাশ টেনে ধরা। এই হ'ল শোভনতার সেই স্বাভাবিক সীমা যার আইন ভাঙে ন্যাকা-রা। জীবনের উপর কর্তব্য আর হৃদয় এই দু'দিকের দাবি মেটাতে গিয়ে রফা ক'রে নেয় মানুষের স্বভাব। সভ্যতার দাবি আর ব্যক্তিমনের প্রবৃত্তির মধ্যে লিটিগেশন লেগেই আছে। যে সুপ্রীম কোর্টে এই সব মামলার নিষ্পত্তি হয়, সেই আদালত হ'ল মানুষের স্বাভাবিক পরিমিতিবোধ। এঁকে দেখালে হয়ত আর একটু পরিস্ফুট হবে এই রূপক :

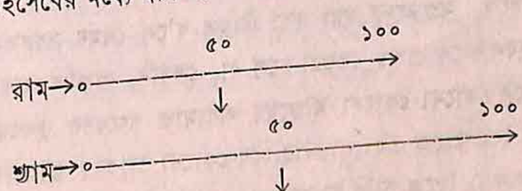


কল্পনা ক'রে নিলাম জীবনরীতিতে সৌন্দর্যের অনুপাত শতকরা হিসেবে মাপা যায়। তাহলে টিপিকাল সমাজভুক্ত মানুষের আ প্রিওরি মাত্রাবোধ, ধ'রে নিচ্ছি, জীবনযাপনের ধরনে যতখানি সৌন্দর্য সঞ্চার করা সম্ভব তার ৫০% ভাগ বাদ দিতে বলবে সভ্যতার খাতিরে। এরকম ভেবে নিলে আলোচনার পরিষ্কার কাঠামো পাওয়া যায়।

রক্তমাংসের মানুষের বেলায় স্বভাবতই এককেজনের মাত্রাবোধ এককে রকম রায় দেবে, কারুর তিরিশ, ভয়ানক ন্যাকাদের হয়ত নব্বই। একই লোকের স্বভাব নানা বয়সে মাত্রা স্থির করবে বিভিন্ন জায়গায় : সত্তর থেকে হ্রাস পেয়ে হয়ত তিরিশে এসে ঠেকবে, পুরনো উপন্যাস দ্বিতীয়বার প'ড়ে ভদ্রলোক অবাক হবেন এই ভেবে যে এমন অবিশ্বাস্য সপি স্টাফ ওঁর ছোট-

বেলায় ভাল লাগত কী ক'রে। বিভিন্ন লোকের, বিভিন্ন বয়সের মাত্রার তারতম্যই একটা কারণ যে জন্যে একের ব্যবহার অন্যের মনে হয় 'ন্যাকা-ন্যাকা'।

তার মানে কি এই যে যেখানে যার স্বাভাবিক মাত্রা—তিরিশ বা সত্তর যাই হোক না কেন—সেটাকেই পঞ্চাশ ব'লে ভেবে নিয়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের মাপমতো অন্যদের চালচলন, কথাবার্তা, গদ্য আর অশ্রুর বিচার করে, দরকার মতো 'ন্যাকা' লেবেল সেঁটে বেড়ায় এর ওর গায়ে? ভীষণ ভুল হবে কিন্তু এরকম ভাবলে। ব্যাপারটা অনেক জটিল। নিজের মাপ-কাঠি সবক্ষেত্রে অন্যদের বেলায় প্রয়োগ করি না আমরা। প্রকৃতিস্থ কোনো চল্লিশোর্ধ্ব ভদ্রলোক একটা দশ বছরের মেয়ের কাছ থেকে তাঁর মতো ভাবভঙ্গী আশা করবেন না। বিচার থেকে রেহাই দিই অনেককে, পরিস্থিতি মনে রেখে ক্ষমা করি: জড়বুদ্ধি, পাগল, মুমূর্ষু রোগী, স্বজন-হারানো কেউ, নিরাশ্রয় ভিখিরি, শোষিত শ্রমিকের ব্যবহার কী রকম হওয়া স্বাভাবিক? ভিন সংস্কৃতির মানুষের কাছে কী ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করব সেটা নির্ভর করে আমাদের অভিজ্ঞতানির্ভর পরিশীলনের উপর। বাঙালীদের হয়ত অনেক পাঞ্জাবী 'জাতিগতভাবে ন্যাকা' ব'লে ভাবেন, কিন্তু এ বিষয়ে কলকাতাবাসী বিদগ্ধ পাঞ্জাবীদের ধারণা নিশ্চয়ই অন্যরকম। তবে, এসবই অপেক্ষাকৃত বাহ্য। সবচেয়ে বড় জটিলতা সেটাই যেটা আমরা সচরাচর হিসেবের মধ্যে ধরি না—সকলের সৌন্দর্যবোধ সমান তীব্র নয়:



এরকম হ'লেই সমস্ত হিসেব ভেস্তে যায়। আর সবই মানুষ বোঝে, বরদাস্ত করতে পারে, কিন্তু 'সকলের স্বভাব মেজাজ বেসিকালি আমার মতো নয়' এটা কেউ ভাবতেই পারে না। খাঁচার পাখি আর বনের পাখির পক্ষে পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারা অসম্ভব, ওদের দেখা হওয়াটাই মস্ত এক ভুল বোঝাবুঝি। 'কোন ভলিউমে রেডিও শুনতে ভাল লাগে' এসব তুচ্ছ জিজ্ঞাসা ওদের মতভেদের বিষয় নয়, একজনের ব্রডকাষ্টিং ফ্রীকোয়েন্সিই

আসবে না কখনো আরেকজনের রিসীভারে কেননা ওয়েভলেংথ একেবারে আলাদা।

কমিউনিকেশন গ্যাপের ফলে এমন হতেই পারে যে একজনের বলা 'ন্যাকা'র শ্লেষ আরেকজন গায়ে মাখলই না, সংগত কারণ নেই ব'লে। তার নিজের স্বভাবনির্দিষ্ট মাত্রার বিচারেই সে হয়ত নিখুঁত ব্যবহার করছে। আবার এও সম্ভব, কেউ হয়ত 'নিশ্চিন্ত ন্যাকা', নিজের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনই নয় (সবাই কি সব দিকে মন দিতে পারে ?), অন্যদের তাকে যত ন্যাকাই লাগুক না কেন। তাল যে কাটে সে জেনেশুনেই কাটে, এমন না হ'তেও পারে।

যদিই বা জেনেশুনে ন্যাকা হয় কেউ, লঙ্ঘন করে স্বাভাবিক শোভনতার সীমা, সে কি সবসময় ইচ্ছে ক'রে ? বেশির ভাগ লোকেরই ঔচিত্যবোধ, সাধ, অভিপ্রায়, আচরণের মধ্যে অল্পবিস্তর ফাঁক রয়ে যায়। এখানেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন ? অনেককেই নিজের পক্ষে 'স্বাভাবিক' ব'লে মেনে নিতে হয় সত্যিকারের স্বভাবনির্দিষ্ট আচরণের বদলে ভয়াবহ পরধর্ম। (প্রধানত সামাজিক আর প্রাকৃতিক পরিবেশের দোষেই হয় এটা, সে অবশ্য ভেবে লাভ নেই।) এরকম মানুষ প্রায়ই তার সামাজিক ভূমিকার দাবি মেটাবার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও পেরে ওঠে না। কিছু হয়ত আলস্য। অনেকক্ষেত্রে কিন্তু পেরে ওঠা সত্যিই অসম্ভব। কয়েক ধরনের পঙ্গুতা একান্তই অচিকিৎস্য।

অন্যদিকে, অসুস্থদের দয়া করা উচিত ব'লে যেমন সবরকম কুঁড়েমি ভীরুতা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, তেমনি, প্রকৃতি আর সমাজের খামখেয়ালে কোনো কোনো মানুষের অসামান্য সংবেদন কুঁকড়ে, দুমড়ে, মুচড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই শোচনায়, যে-কোনো ন্যাকার ন্যাকামি বরদাস্ত করব এমন কথা দিতে পারি না আমরা। স্বভাবের দুদিকের বিপরীতমুখী চাপ নিশ্চয়ই অলীক নয়। জীবিকা আর সংবেদনের দোটানার কথা মনে রাখা অবশ্যই উচিত। 'ন্যাকা'র মধ্যে কী ধরনের অভিযোগ প্রকাশ পায় সে বিষয়ে অবহিত কেউ কেউ হয়ত কথাটা প্রয়োগ করার ব্যাপারে একটু সাবধান হওয়া দরকার মনে করবেন। কিন্তু 'ন্যাকা' অভিযোগের মধ্যে একটা সত্য আছে। সমাজ টিকিয়ে রাখতে হ'লে পর, বেশির ভাগ লোকের মাত্রাবোধ মোটামুটি রক্ষণশীল হওয়া চাই। 'ন্যাকা' কথাটা হয়ত

একটু ধারালো। কিন্তু মোলায়েম বাক্য যেমন দরকার মতো সান্ত্বনা দেয়, শুশ্রূষা করে মনের, তেমনি তীক্ষ্ণ শব্দবাণ একেক সময় কাজে লাগে। কেবল শল্যচিকিৎসার কথা ভাবছি না। পিছনে লাগতে চাইলেও এধরনের শব্দ দারুণ কাজ দেয়। আর কে না জানে অনেকে মিলে কারুর পিছনে লাগতে কী রকম মজা।

কেউ কেউ বলেন, এমন সমাজ নির্মিত হ'তে পারে (হবেও বোধহয়) যাতে প্রত্যেকের স্বভাবের ললিত দিক অনির্বচনীয় মুক্তির স্বাদ পাবে, সবাই যাপন করবে শতকরা একশ ভাগ শ্রীমণ্ডিত জীবন, প্রতি মুহূর্তে দিকে দিকে উৎসবের রোমাঞ্চ। এ মহৎ কল্পনাকে ছোট ক'রে দেখতে পারে না কোনো হৃদয়বান মানুষ। কিন্তু অমন সুদিন যদি আসে, অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যের মধ্যে ব'সে নতুন সমাজের মানুষ এতটুকু নিঃশ্বাস কি ফেলবে না কখনো। ফেলে আসা সেই সব দিনের কথা ভেবে, যখন 'ন্যাকা'র মতো বিচিত্র রঙিন শব্দ ভেসে বেড়াত এই পৃথিবীর হাওয়ায় ?

১ কিছু হয়ত বদল চোখে পড়ে। যেমন মানুষকে বলে লাজুক, উদ্ভিদের নামকরণ হয় লজ্জাবতী। আরেকটা কথা ব'লে নিই। এইসব প্রয়োগের অনেকগুলোই অলংকার-শাস্ত্রের মাপকাঠিতে রূপক, সমাসোক্তি, লুপ্তোপমার পর্যায়ে পড়বে। আলংকারিক বিবেচনার কথা মনে রাখলে ক্ষতি নেই। তবে কিনা, দরকারও নেই আপাতত।

দুই সোস্যুরের ভাষাচিন্তা

ভূমিকা

সুইসদেশে দুই ভাই ছিলেন। ফেয়ারদিন্যাঁ দ্য সোস্যুর, র‍্যনে দ্য সোস্যুর। ফেয়ারদিন্যাঁর বই ইংরিজিতে পাওয়া যায়। র‍্যনের বোধহয় অনুবাদ নেই। দুজনেই এ শতকের আরম্ভে ভাষাচিন্তার নতুন পথ তৈরি করেছিলেন।

ফেয়ারদিন্যাঁর চিন্তা ছিলো সময়োপযোগী। অনেকে তাঁর কথা লুফে নেয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান জন্মায়। তার সেই প্রথম পর্ব, গ্রন্থনবাদী বা স্ট্রাকচারাল ভাষাবিজ্ঞান, আশেপাশের কোনো কোনো মহলেও ফসল ফলিয়েছে, যেমন ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের নৃবৈজ্ঞানিক ভাবনার ফসল। এখন গ্রন্থনবাদী ভাবনার দম ফুরিয়ে গেছে। অন্য ঝোঁক চলছে এখন, নোআম চমস্কির জোন ব্রেজনানের। এই নতুন দ্রষ্টা দ্রষ্ট্রী ভাষাচিন্তার হাওয়া অনেকটাই বদলে দিয়েছেন। ফলে, র‍্যনে দ্য সোস্যুরের লেখা এখন হাতে পেয়ে লোকেরা লুফে নিলেও নিতে পারে।

লুফে যদি নেয়, তাহলে বোধহয় ফেয়ারদিন্যাঁর কাজেরও নতুন ক'রে মূল্যায়ন হবে র‍্যনের পাশাপাশি। অলস জল্পনা ছেড়ে এবার প্রথমে ফেয়ারদিন্যাঁর কথা বলি কিছু কিছু। তারপর র‍্যনের পালা।

ফেয়ারদিন্যাঁ

প্রথম যৌবনেই তাক-লাগানো কাজ। সংস্কৃত লাতিন গ্রীক ফারসী আইরিশ দিনেমার ইত্যাদির জননী যে আদি ভারোপীয় (ভারত-ইউরোপীয়) ভাষা —যার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই কিন্তু যা নিশ্চয়ই একদা বলা হতো— সেই ভাষায় আ এ ও এইসব স্বরের কী গতিবিধি ছিলো তাই নিয়ে গবেষণা করলেন ফেয়ারদিন্যাঁ, কুড়ি পেরোনোরও আগে। লেখাটা যে প্রতিভাদীপ্ত সেটা তখনই দেখা গেছিলো। প্রশংসাও হলো। কিন্তু বহুদিন বাদে, ১৯২০-৩০ নাগাদ, আস্তে আস্তে বোঝা গেলো ফেয়ারদিন্যাঁ অল্প বয়সে ১৮৭৯ সালে যা করেছিলেন সেটা কী সাংঘাতিক কাজ। গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেরোলো যে, আদি ভারোপীয় যে হ ধ্বনির অস্তিত্ব ফেয়ারদিন্যাঁ

কল্পনা করেছিলেন, সেই হ সত্যিই যে ছিলো তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে হিত্তী ভাষার সদ্যআবিষ্কৃত পুরোনো দলিলে। তার কথা ফেয়ারদিনাঁ বেঁচে থাকতে কেউ জানতো না। ওই হ ধ্বনির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিলো না ফেয়ারদিনাঁর জানা কোনো ভারোপীয় ভাষায়। ওই হ-টার কথা উনি প্রায় মন্ত্রবলে জেনেছিলেন বলতে হবে।

সেই মন্ত্রে উনি পরে দীক্ষা দিলেন ছাত্রদের—জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বই লিখে যেতে পারেন নি। কয়েকজন ছাত্র ওঁর ক্লাসে যা নোট নিয়েছিলো তাই জড়ো ক'রে বেঁধে গেঁথে একটা বই বেরোলো ওঁর মৃত্যুর পর ১৯১৫-য়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের সবাইকেই জেনেভায় প্রক্সিতে ক্লাস করতে হয় ওই বইটার মারফত: 'নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানের পাঠক্রম'। ভাষার নির্বিশেষ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম সার্থক চেষ্টা ওই বইয়ে।

সামাজিকতার সময় 'ভাষাবিজ্ঞানী' শুনলেই লোকে জিগেস করে, কোন কোন ভাষা নিয়ে এই বিশেষ বিজ্ঞতা? উনিশ শতকে শব্দবিদ্যা বা ফিললজি ব'লে যে শাস্ত্রটা ছিলো তার শাস্ত্রীরা এ প্রশ্নের জবাব সহজেই দিতে পারতেন। কেউ ছিলেন লাতিন থেকে উদ্ভূত ভাষা-সমূহের বিশেষজ্ঞ। কেউ বা চীনের অনেকগুলো ভাষার খবর রাখতেন। শব্দবিদ্যা সারাক্ষণ খালি ভাষা থেকে ভাষান্তরে চ'রে বেড়ায়; এতে অতৃপ্তি বোধ ক'রে, 'এই কি জননী তুমি?' ব'লে-ট'লে, ভাষাজিজ্ঞাসুরা এ ভাষা ও ভাষার প্রজাপতি-দশা ছেড়ে এসেছেন ক্রমশ। শব্দবিদ্যা থেকে ভাষাবিজ্ঞানে এই উত্তরণ শুরু হয়েছে ফেয়ারদিনাঁর কালে। প্রক্রিয়াটা হয়তো শেষ হয়নি এখনও।

স্লাভিক শব্দবিদ্যা, টিউটনিক শব্দবিদ্যা, সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দবিদ্যা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্র্যাকটিক্যালের উপকরণবৈচিত্র্যের আড়ালে অভিন্ন যে থিওরি তার উনিশ শতকী অনুসন্ধানেই নির্বিশেষ ভাষাজিজ্ঞাসার ভিত্তি তৈরির চেষ্টা শুরু হয়। ফেয়ারদিনাঁর অধ্যাপনায় ওই চেষ্টার যে পরিস্ফুটন পাই সেটা দেখতে খুব সহজ। উনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, একটা ভাষা কী জিনিস? ওঁর কাছে আমরা শিখি যে এটাই নির্বিশেষে ভাষাবিজ্ঞানের আসল প্রশ্ন; জিগেস করতে জানা চাই; প্রশ্নটার উত্তর খোঁজার প্রচলিত উপায়গুলো তেমন কাজের নয়।

ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দুটো ব্যাপার ভাষা থেকে কীসে আলাদা সেই কথা তুলে ফেয়ারদিনাঁ নেতি নেতির পথে এগিয়েছেন। একটা

হলো বাক্ বা বাক্শক্তি যা সব মানুষের আছে। কিন্তু সবাই তো এক ভাষা বলে না। একটা নেতি এই ; ভাষা বাক্ নয়। ভাষা আর যা নয় তা হলো বলন ('কী চলন চলে, কী বলন বলে')। পাঁচজন যদি কুড়ি-বার ক'রে 'তরকারি' বলে তাহলে একশোটা তরকারি-বলন হলো। তাই ব'লে 'তরকারি' শব্দটার একতা কি শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে? ভাষা অনেক-গুলো বটে। কিন্তু প্রত্যেকটা ভাষার নিজস্ব সংহতি রয়েছে। সেই ঐক্যের আধার ভাষাভাষীদের একেকটা সম্প্রদায়। তেলুগুভাষী সমাজে তেলুগুর ঐক্য। ওড়িয়াভাষী সম্প্রদায়ে ওড়িয়ার সংহতি।

বলনের আধার সমাজ নয়, ব্যক্তি ; কবার তরকারি বলবো তা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। বাকেরও আধার সমাজ নয়—মানবজাতি। সে স্তরে ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন ওঠে না।

ভাষাই সমাজে অবস্থিত। তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার জোর খাটে না ; খাটলে প্রত্যেকে নিজস্ব ভাষায় কথা বলতো, ফলে কেউ বুঝতো না। মানব-জাতির বাক্শক্তিও ভাষার চেহারার নিয়ন্তা নয় ; তা যদি হতো তাহলে সব যুগের সব মানুষের ভাষা এক হতো (তাতে কী ক্ষতি হতো পাঠকই ভেবে দেখুন)। বলনের ব্যক্তিস্বাধীনতা এক দিকে, বাকের জাতিজৈব বাধ্যতা অন্য দিকে। মাঝখানে একেকটা সমাজ আছে যে যার নিজের ভাষা নিয়ে। ভাষায় স্বাধীনতাও আছে, আবশ্যিকতাও আছে। স্বাধীনতার কথাই আগে বলি।

ফেয়ারদিনাঁ মুদ্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন ভাষার এককের। এক পিঠে উচ্চারণ, অন্য পিঠে তাৎপর্য। ভাষার একককে উনি বলতেন 'সিঞ' signe, তার প্রতিশব্দ হিসেবে 'কথা' চলতে পারে বাঙলায়। 'তরকারি'ও একটা কথা, 'তরকারি ভালো হয় নি'ও একটা কথা, তবে জোটবাঁধা কথা, ওর ভেতরে একাধিক কথা রয়েছে। 'তরকারি' একা কথা। ইংরিজি 'ভেজিটেবল' আর ফরাসী 'লেগ্যুম' এর প্রতিশব্দ 'তরকারি'। স্পষ্টতই বাঙলাতেও কথাটা 'তরকারি' হবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। প্রয়োজন থাকলে, ইংরেজ ফরাসীরা ও রকম বিদঘুটে কথা ব'লে পার পেয়ে যেতো না—ওরাও 'তরকারি' বলতে বাধ্য হতো। আসলে যে ভাষার যা প্রাণ চায়। আনতাবড়ি বা যদৃচ্ছ একেকটা চেহারা একেক ভাষায় প্রচলিত। এইখানে ভাষার স্বাধীনতা। ফেয়ারদিনাঁ এটাকে বলেন কথার যদৃচ্ছা।

ব্যাপারটা খালি এ নয় ভাষাভেদে একই তাৎপর্যের ধ্বনিরূপ পালটে যায়। কথাগুলোই আলাদা। বাঙলা 'কাটা, হাড়' কথা দুটোর সঙ্গে 'থর্ন, বোন' মিলিয়ে দেখুন—

	ফুলের	মাছের	জন্তুর
বাঙলা	কাঁটা	কাঁটা	হাড়
ইংরিজি	থর্ন	বোন	বোন

বাস্তবের একটা ক'রে টুকরোর সঙ্গে আওয়াজের একটা ক'রে খণ্ডের বিয়ে হয়ে কথা তৈরি হচ্ছে দুই ভাষাতেই। কিন্তু শুধু আওয়াজই আলাদা নয়। বাস্তবকে ভাগ ক'রে নেওয়ার ধরনটাও ভিন্ন। কাঁটার সঙ্গে হাড়ের যেখানে তফাত, থর্ন আর বোনের সীমারেখা ঠিক সে জায়গায় নয়। এটাই 'কথার যদৃচ্ছা'র, ভাষার স্বাধীনতার, গভীরতর মানে।

স্বাধীনতা মানে স্ব-অধীনতা। বাঙলার স্ব অর্থাৎ নিজস্বতা এই যে, ধরুন, বাঙলায় ভেজিটেবল বা লেগুয়ম না ব'লে তরকারি বলা হয়। কিন্তু একবার সেই স্ব ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার অধীনে তার নিয়ম মেনেই চলছে বাঙালীরা। তরকারি বোঝাতে আমরা একবার পুনশ্চ, একবার দ্রিঘাংচু, একবার চাণক্য বলি না। (কেন, সবজি বলি তো ? ঠিকই, কিন্তু যা খুশি তাই বলি না ; সেই কথা হচ্ছে।) তরকারি বলতে আমরা একবার রাস্তা একবার ডিম, একবার আকাশ বুঝি না। যথাযথ তরকারিই বলি এবং বুঝি। এই যথাযথর ব্যাপারটা কথার আবশ্যিকতা।

বিভিন্ন পরিবেশে যে তরকারির কথাটা একই থাকে, তার উচ্চারণ আর তার মানে যে যথানিয়মে মুদ্রার দু পিঠের মতো অবিচ্ছেদ্য রয়ে যায়, এই অবিকল আবশ্যিকতার একটা জরুরি দৃষ্টান্ত পাই জোটবাঁধা কথায়। 'তরকারি' তো একা কথা, 'তরকারি ভালো হয় নি' জোটবাঁধা কথা, 'লুচির সঙ্গে তরকারি না হ'লে চলে না' আরেকটা জোটবাঁধা কথা। এই শেষের দুটো জোটে প্রায় সবই আলাদা। মিল আছে 'তরকারি' কথাটাতে, দুই জোটেরই সদস্য সে। তরকারি ভালো হয় নি বোঝাতে লোকে যদি বলতো 'জগঝম্প', এবং লুচির সঙ্গে তরকারি না হ'লে চলে না বোঝাতে 'সংকর্তব্য-বিমূঢ়', তাহলে স্বীকার করতেই হতো যে কথার আবশ্যিকতা মেনে চলার রেওয়াজ নেই, সবই ভাষার খামখেয়াল। কিন্তু ভাষা তো সে রকম নয়।

একা কথারা দরকারমতো জোটই বাঁধে, জটিল-মানে-ওয়ালা কোটি কোটি একা কথা গজিয়ে ওঠার বদলে।

তা, জোটবাঁধা কথা আর একা কথা তো ঠিক একভাবে কাজ করে না। কোনো একটা ভাষায় একা কথার সংখ্যা যতই বেশি হোক খুব বেশি না— দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, এই রকম। অভিধানে ধরানো যায়। কিন্তু জোটবাঁধা কথা তো সত্যিসত্যিই অগুনতি। যত লম্বা তালিকাই করুন থই পাবেন না। কাজেই সে চেষ্টাও করে না কেউ। একটা ভাষার বর্ণনা দেবার সময় লোকে দুরকম কাজ করে—(ক) সেই ভাষায় যত একা কথা আছে তার অল্পবিস্তর সম্পূর্ণ তালিকা দেয়, সেটাকে বলে অভিধান ; (খ) একা কথারা কীভাবে জোট বাঁধে তার রীতির কথা বলে, সেটার নাম ব্যাকরণ।

'তরকারি'র মানে আর উচ্চারণ নানারকম জোটে এক থাকে, এই নিয়ে এক্ষুনি যে কথাটা হচ্ছিলো তার সূত্রে বলা চলে, ভাষার আবশ্যিকতার অন্যতম প্রধান প্রকাশ দেখি একা-কথাদের জোট বাঁধার ধরনে। খালি 'তরকারি'র দিকে তাকালে আপনি প্রধানত এটাই খেয়াল করবেন যে ধ্বনি তাৎপর্য-মেলানো এই রূপ নির্বাচনের ব্যাপারে বাঙলা তার স্বাধীনতা খাটিয়েছে। তরকারিকে 'তরকারি' বলার কোনো দরকার ছিলো না। জোটবাঁধা কথার দিকে তাকান এবার।

(১) তরকারি ছাড়া (২) তরকারি সমেত
(৩) মাংস ছাড়া (৪) মাংস সমেত

'তরকারি' বলার কোনো কারণ না থাকলেও 'তরকারি ছাড়া' বলবার কিন্তু দরকার আছে। (১)-এর আরম্ভে (২)-এর প্রথম অংশের সঙ্গে মিল চাই, আর (৩)-এর আরম্ভের সঙ্গে চাই তফাত। (১)-এর শেষ ভাগে (২)-এর দ্বিতীয়ার্ধের সঙ্গে তফাত চাই, আর (৩)-এর শেষের সঙ্গে চাই মিল। এইসব মিল আর তফাত চাইলে তো (১)-এর জোটে প্রথম সদস্য হিসেবে তরকারিকে এবং দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে ছাড়াকে বাছতেই হবে। এখানে বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের শাসনগত দিকটা দেখতে পাচ্ছি।

জোটবাঁধা কথায় যদি ভাষার শাসনের প্রকাশ দেখি, আর একা কথায় ভাষার স্বাধীনতার প্রকাশ, তাহলে বলতে পারি, একটা ভাষার ব্যাকরণে

তার নিয়ম অর্থাৎ আবশ্যিকতার খবর থাকবে, আর অভিধানে পাবো একা কথাদের তালিকা—যেসব অকারণ, বেনিয়মী রূপ স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের তালিকা, যেমন 'তরকারি', 'মাংস', 'ছাড়া', 'সমেত'। জোটবাঁধা কথাদের তো তালিকা সম্ভব নয়, আর একা কথাদের বেলায় তালিকাই একমাত্র গতি ; সেজন্যেই এক যাত্রায় পৃথক ফল।

কথাদের জোটবাঁধার নিয়ম নিয়ে ফেয়ারদিনঁ। সামান্য কিছু কিছু সূত্র ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। যেমন, উনি খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন জোটের দুই আয়তন বা ডাইমেনশনের কথা।

(৫) { { ফিল্ম শেষ হওয়ার / নটার } পরে / সঙ্গে সঙ্গে } ট্রামে ভিড় বাড়লো।

(৬) (ক) ফিল্ম শেষ হওয়ার পরে ট্রামে ভিড় বাড়লো।
(খ) নটার পরে ট্রামে ভিড় বাড়লো।
(গ) সঙ্গে সঙ্গে ট্রামে ভিড় বাড়লো।

দু-রকম সম্পর্কের নমুনা আছে এখানে—একত্রতার সম্পর্ক আর সাম্যের সম্পর্ক। ব্যাকরণের দিক থেকে দেখলে (ক)-এর 'ফিল্ম শেষ হওয়ার' আর (খ)-এর 'নটার' পরস্পরের সমান ; ওদের সাম্যের সম্পর্কটা দেখানো রয়েছে (৫)-এ। (ক)-এ একত্র হয়েছে 'ফিল্ম শেষ হওয়ার' আর 'পরে' ; ওদের একত্রতার সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। একই জোটে 'ফিল্ম শেষ হওয়ার' বসেছে 'পরে'র-আগে—এটাই ওদের একত্রতা।

(৫)-এর জ্যামিতিতে দুই আয়তন ধ'রে কথারা এই দু-জাতীয় সম্পর্ক পাতায়। বাঁ-ডানের আয়তনটা একত্রতার সম্পত্তি। ওপর-নীচের মই বেয়ে সাম্যের সম্পর্ক ওঠবোস করে। মই না ব'লে একটা উপাদেয় সংস্কৃত শব্দ লাগাতে পারি : পর্যায়। 'ফিল্ম শেষ হওয়ার পরে', 'নটার পরে' আর 'সঙ্গে সঙ্গে' এরা তিনজন একই পর্যায়ভুক্ত ; এরা পরস্পরের পর্যায়সঙ্গী। বাঁ-ডানের দিকটা জোটের দিক। (গ)-এ 'সঙ্গে সঙ্গে' আর 'ট্রামে ভিড় বাড়লো' একই জোটে বাঁধা ; এরা পরস্পরের জোটসঙ্গী।

একটা ভাষার নানারকম জোটে আর নানা ধরনের পর্যায়ে একা-কথারা কী রকম সঙ্গ দেয় পরস্পরকে—এইটে সেই ভাষার সংগঠন অর্থাৎ স্ট্রাকচারের প্রশ্ন। এই প্রশ্ন পর্যন্ত নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানকে ঠেলে নিয়ে

এসেছেন ফেরারদিনাঁ দ্য সোস্যুর। এই শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানের সর্বত্র ওই সংগঠনচিন্তার রেশ রয়ে গেছে।

কিন্তু, ভাষার এ রকম ছবিকে কোনো ভারতীয় খুশি মনে স্বাগত জানাতে পারে কি ? ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়'তে বাক্য আর পদের আলোচনা ছিলো। বইটা তো নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞান নিয়েই লেখা। বাক্য আর পদ নিয়ে ফেয়ারদিনাঁ কিছু বললেন না তো। পদকে একা কথার সমান ভাবা, কিংবা বাক্যকে জোটবাঁধা কথার সমান ভাবা, ঠিক নয়। 'তরকারি সমেত' জোটবাঁধা কথা, কিন্তু বাক্য নয়। 'নির্ভরযোগ্য' পদ, কিন্তু একা কথা নয়—'নির্ভর' আর 'যোগ্য' জোট বাঁধছে পদটাতে। 'লোকগুলো'র 'গুলো' একা কথা কিন্তু পদ নয়।

একত্রতা আর সাম্যের আওয়াজ তুলে কী ক'রে বাক্য আর পদের স্বরূপনির্দেশ হ'তে পারে, সংগঠনী ভাষাবৈজ্ঞানিক মহলে তা বার করবার চেষ্টা হয়েছিলো বিস্তর। সাফল্য জুটলো অল্প। বাক্যকে ঠিকমতো গুরুত্ব দিতে প্রথম পারলো সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান, যার নেতা নোআম চমস্কি ষাটের দশকে ভাষাচিন্তার ধারা অনেকটা পালটে দিয়েছেন। পদের যে মর্যাদা পাওনা তাকে তা দেবার চেষ্টা করেছেন সঞ্জননী বিজ্ঞানীরাই কেউ কেউ। তাঁদের নেত্রী জোন ব্রেজনান। সঞ্জননী চিন্তার এই বিশেষ ধারা লেক্‌সিকালিস্ট বা পদাশ্রয়ী ব'লে পরিচিত। পদাশ্রয়ী চিন্তা এখনও শিশু। জ্যাকেনডফ, অ্যারোনফ, গ্রিম্‌শ, ব্রেম ইত্যাদির ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা সূত্র জড়ো ক'রে, ব্রেজনানের নিজের কাজের ভিত্তিতে এবং প্রধানত তাঁরই নেতৃত্বে, সঞ্জননী ভাষাজিজ্ঞাসার এই বিশিষ্ট ঘরানা নিজের পথ খুঁজে নেওয়া শুরু করে ১৯৭৫-এর পর।

কম্রী, কীনন, পোস্টাল, পার্লমাটার জনসন ইত্যাদি যেসব ভাষাবিজ্ঞানী কাজ করছিলেন সঞ্জননী চিন্তাধারার একটু তফাতে থেকে—নানা কারণে যাঁদের কাজ হালের ভারতীয় পড়াশুনার ওপর বেশ ছায়া ফেলেছে—তাঁদের গবেষণারীতির সঙ্গে পদাশ্রয়ীদের মিল অনেকটাই। কম্রী-জনসনরা নিজেদের কাজের ধরনটাকে বলেন রিলেশনাল অর্থাৎ যোগাচারী। যোগ তো সচরাচর পদের সঙ্গে পদেরই হয়। যোগাচারী আর পদাশ্রয়ী, দুই ঘরানাই কর্তা কর্ম ইত্যাদি কারক নিয়ে ভাবেন ; মিলটা প্রধানত এখানে। এবং এতে করে পাণিনীয় রীতির কাছাকাছি চ'লে এসেছেন দুই দলই।

র‍্যানে

এই আবহে যাঁদের ভাষাজিজ্ঞাসা আত্মপরিচয় খুঁজছে তাদের ভালো লাগার কথা ফেয়ারদিন্‌ঁ। দ্য সোস্যুরের ভাই র‍্যানেকে। র‍্যানেও একেবারে অখ্যাত নন। প্রবাদের মুখে ছাই দিয়ে এই যোগী নিজের গাঁয়ে ভিখ পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক ভাষা এস্পেরান্তোর র‍্যানে ছিলেন নামজাদা বৈয়াকরণ। ১৯১০ সালে উনি এস্পেরান্তো পদের নির্মাণরীতির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে র‍্যানে ১৯১৫ সালে এক চূড়ান্ত বিবরণ পেশ করেন। তৎকালীন বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর গৃহীত সেই দলিল এখনও এস্পেরান্তো ব্যাকরণে স্বীকৃত ভিত্তি। দলিলের নাম 'এস্পেরান্তো পদতত্ত্বের মূলনীতি'।

নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানে আলোচনায় এ ধরনের দলিলকে অবান্তর মনে হতে পারে। অনেক পাঠক ভাববেন, এস্পেরান্তোর মতো ভাষাবিশেষে পদের অঙ্গসংস্থান যতই মনোযোগ্য হোক না কেন, সে জাতীয় অনুসন্ধান থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বেরোবে না যার দাম আছে সব ভাষায়, চিরকাল। একবার আপত্তি তোলা আরম্ভ ক'রে সেই পাঠক সেই উৎসাহে আরো বলতে পারেন, পদ পদ ক'রে এত মাতামাতি ভালো নয়, কারণ গ্রীনল্যাণ্ডীয় এস্কিমোর মতো কোনো কোনো ভাষার স্ফীতকায় 'পদ' প্রায় বাক্যের সমান জটিল ; পদ আর বাক্যের পার্থক্যের আলোচনা আদপেই নির্বিশেষ নয়।

গ্রীনল্যাণ্ডীয় আপত্তি তুলনেওয়ালা পাঠক নেহাতই বৈনাশিক। তিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তার অসম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতেই আগ্রহী। তাঁর নির্বাসন হওয়া উচিত এমন গ্রহে যেখানে নির্বিশেষত্বের দোহাই দিয়ে প্রত্যেকটি স্থানীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য গ্রহসুদ্ধু সকলের ভোট চাওয়া হয়। এস্কিমোর মতো স্ফীতপ্রদ ভাষা অল্পই আছে। ব্যতিক্রমী ভাষারা কেন ব্যতিক্রম এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তদন্ত ক'রে দেখার মতো। কিন্তু, যেসব ভাষায় বাক্য আর পদের স্পষ্ট দ্বৈত আছে, সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখে পদ কী জিনিষ তা যদি ভালো ক'রে জেনে নিই, তাহলেই তো কোথাও কোথাও দ্বৈতটা কেন দুর্বল বা মৃতপ্রায় সেটা জিগেস করতেও সুবিধে হবে, তাই না ?

বৈনাশিকরাও উপকারী। আপত্তিটার জবাব দিতে গিয়ে দুয়েকটা কথা পরিষ্কার হলো। বেশি বেশি নির্বিশেষ হ'লে বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি ঘটে। ফেয়ারদিন্‌ঁার সেই বিপত্তি ঘটেছিলো, সংগঠনী ভাষাবিজ্ঞানীরাও

তাতে অংশীদার ছিলেন। ওঁরা ঠিক করেছিলেন, নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র হিসেবে খালি তাই নেবেন যা সমস্ত ভাষার বেলায় খাটে। ফলে কয়েকটা স্পষ্ট অথচ অগভীর ধারণাকে ওঁরা ঘরে স্থান দিলেন। পদের কপালে জুটলো নির্বাসন। ওঁরা ভেবেছিলেন সরলতর ধারণার সাহায্যে বুঝি পদ ব্যাপারটা তৈরি ক'রে নেওয়া যায়। দেখলেন তা যায় না। ভেবেছিলেন 'কথা', 'একা কথা' এগুলো অন্তত তামাম ভাষায় পাওয়া যাবে। দেখলেন সে ধারণাও ভুল। ওই এস্কিমো টেস্কিমোতেই আটকায়।

নির্বিশেষ গবেষণাকে একেবারে নাকচ করার কোনো মানে হয় না। একটু রয়ে সয়ে কাজ চালাতে হবে, এই আর কি। আর, বৈজ্ঞানিক কর্মের অন্য পথ যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের ঠিক অতখানি চট্ ক'রে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় উচিত হবে না।

ফেয়ারদিন্ঁার অন্বিষ্ট ছিলো নির্বিশেষ ভাষাবিজ্ঞান। কোনো ভাষার বিজ্ঞান নয় ব'লেই তার সব ভাষায় চলবার কথা। র‍্যনে খাটছিলেন একটা নিরপেক্ষ অর্থাৎ রফা-করা ভাষার তত্ত্বনির্মাণে। সে ভাষার রূপে অনেক উৎসের উপাদান নতুন সংহত বন্ধনে যুক্ত। কাজেই তার গঠনে কোনো বিশেষ উৎসের একপেশে প্রভাব নেই। স্বচ্ছ চেহারায় দেখতে পাই এমন সব বিন্যাস বা নিয়ম যা অনেকগুলো উৎস-ভাষাতেই অল্পবিস্তর স্পষ্টতায় হাজির রয়েছে। ফেয়ারদিন্ঁার প্রস্তাবিত কর্মরীতি থেকে সর্ব-ভাষা-সমন্বিত কোনো আহামরি তত্ত্ব বেরোয় নি। ওঁর রীতির ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে যেসব আধুনিক পণ্ডিত সচেষ্ট তাঁদের সঙ্গে র‍্যনের সুর মিলছে আশ্চর্য রকম। দেখাই যাক না র‍্যনের মূল কথাগুলো কী ছিলো।

একই এস্পেরান্তো শব্দের বিভক্তি পালটে বিশেষ্য, বিশেষণ আর ক্রিয়া এই তিন জাতির মধ্যে যাওয়া আসা করা যায়। এই যাতায়াত নিয়ে র‍্যনে ভেবেছেন প্রচুর। প্রক্রিয়াটার নমুনা দিই। Helpi 'সাহায্য করা' এই ক্রিয়া থেকে চ'লে যেতে পারেন বিশেষ্যে— helpo 'সাহায্য' অথবা বিশেষণে : helpa 'সহায়ক'। Honesta হোনেস্তা 'সৎ' এই বিশেষণ থেকে আসতে পারেন honesto 'সতা' এই বিশেষ্যে, কিংবা ক্রিয়ায় : 'সদাচরণ করা'। Bruo ব্রুয়ো 'আওয়াজ' থেকে রওনা দিলে পৌঁছবেন এই দুয়ের একটাতে : brui ব্রুয়ি 'আওয়াজ করা', আর brua ব্রুয়া 'সশব্দ'।

বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া, এদের এক জাত থেকে বেজাতে পরিবর্তনের

এই ব্যবস্থা—স্রেফ বিভক্তি পালটানো। অর্থের সূক্ষ্ম বর্ণভেদ বোঝাতে প্রত্যয় চ'লে আসে বিভক্তির ঠিক আগে। Bru-a 'সশব্দ' কথাটাতে বিভক্তি হচ্ছে a; bru-em-a 'আওয়াজ-প্রবণ' কথাটার em প্রত্যয় প্রবণতা বোঝাবার জন্যে বিভক্তির আগের জায়গাটা দখল করেছে। তেমনি bruanta য় ant প্রত্যয় থাকায় এর মানে আওয়াজ-করন্ত, অওয়াজ করছে—এমন। Bruanta tramo, আওয়াজ-করছে-এমন ট্রাম। তাহলে em, ant হচ্ছে প্রত্যয়, আর o, a i বিভক্তি। কয়েকটা প্রত্যয়ের সঙ্গে র‍্যনে বিভক্তির বিশেষ সম্পর্কের কথা খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন। একটা উদাহরণ দিই।

Honesta 'সৎ' থেকে রওনা হয়েছেন ব'লে সোজা honesto 'সততা' এই ভাববাচক বিশেষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু brua 'সশব্দ' থেকে ও ভাবে bruo য় গিয়ে 'সশব্দতা' পাবেন না। কারণ brua কোনো টার্মিনাস নয়। ও স্টেশনটা মাঝখানে। Bruo ই টার্মিনাস; bruo মানে শব্দ। তাহলে কী করা? সশব্দতার এস্পেরান্তো কী? Brueco ব্রুয়েৎসো; ec প্রত্যয়টা সশব্দতার তা-র মতন। ইচ্ছে করলে honestoকেও honesteco বলতে পারেন, বাঙলায় অনেকে সখ্য বা প্রসারকে যেভাবে সখ্যতা বা প্রসারতা বলে। তবে, সখ্যতা প্রসারতার তা-র মতোই honesteco র ec প্রত্যয়টা অতিরিক্ত—ওটা না রাখলেও চলে। সশব্দতার তা আর brueco র ec কিন্তু অপরিহার্য। বাদ দিলে কথার মানে পালটে যাবে। তার কারণ, র‍্যনের মতে, brueca 'সশব্দতা' কথাটাতে ec বলে দিচ্ছে যে আপনি bruo 'শব্দ' থেকে একবার bruo 'সশব্দ'তে গিয়ে তারপর বিশেষ জাতিতে ফিরে আসছেন। আর honesta 'সৎ' নিজেই যেহেতু যাত্রা শুরুর জায়গা, সেইজন্যে, 'সততা' অর্থে honesteco বা honesto যেটাই বলুন, আপনি যে honesta থেকে বিশেষ্যজাতিতে আসছেন এটা আলাদা ক'রে বোঝার জন্যে ec এর মতো কিছু লাগবে না। আপনি এখানে ec বলতেও পারেন, না বললেও চলে।

তথ্য থেকে তত্ত্ব আলাদা করার কাজে এবার হাত না দিলে এমন জট পাকিয়ে যাবে যে তা বলবার নয়। র‍্যনে দ্য স্যোস্যুর কিছু ভাববার আগেই এস্পেরান্তোভাষীরা সশব্দতাকে সবসময় brueco এবং সততাকে কখনো বা honesteco বলতো। ওজন্যে র‍্যনের তত্ত্ব দায়ী নয়। ওটা

এস্পেরান্তো ভাষার তথ্য। তত্ত্বের ভূমিকা এইখানে—র‍্যানে খেয়াল করিয়ে দিলেন যে সততার আরম্ভ বিশেষণজাতীয় honestaয়, আর সশব্দতা রওনা হয়েছে বিশেষ্যজাতীয় bruo থেকে। র‍্যানে বললেন, সেজন্যে honesto honesteco দুটোই হয় অথচ brueco র ec অপরিহার্য। র‍্যানের কাজের তথ্য আর তত্ত্বের সম্পর্কের এ দিকটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। এস্পেরান্তো যেভাবে এমনিতেই চলছে তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটা কী—এই ছিলো র‍্যানের প্রশ্ন। ফতোয়া জারি করতে বসেন নি। যা চলছে তার ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন।

এমনিতেই এস্পেরান্তোয় প্রবণ-অর্থে ema ব্যবহৃত হয় স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে। আলাদা ক'রে ecoরও ব্যবহার আছে, eco মানে বৈশিষ্ট্য। তাত্ত্বিকের একটা কাজ হলো এরকম খবরের প্রতি সদ্‌বিচার করা। স্পষ্টতই এই ভাষায় প্রত্যয়রাও শব্দের মতো। সব ভাষায় এমন নয়। বাঙলায় তো বলি না 'ওই শহরের তিনটে তা—সশব্দতা, বর্ণিলতা, আগ্নেয়তা'। ইংরেজীতেও অচল the three nesses of the city—noisiness, colourfulness, fieriness। এস্পেরান্তোয় কিন্তু la tri ecoj de tiu urbo—brueco, koloreco, fajreco খুবই স্বাভাবিক শুনতে: লা ত্রি এৎসোই দে তিয়ু উর্বো—ব্রুয়েৎসো, কোলোরেৎসো, ফাইরেৎসো।

এস্পেরান্তোর এই বৈশিষ্ট্যের ওপর র‍্যানে জোর দিয়েছিলেন। সেই-সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিলো ওঁর সংযম। প্রত্যয় শব্দের মতো, এ থেকে র‍্যানে অকস্মাৎ এই কল্পনায় পৌঁছে যান নি যে শব্দও প্রত্যয়ের জায়গা নিতে পারবেই পারবে। যেমন, eco প্রত্যয়ের মোটামুটি সমার্থক শব্দ kvalito; la tri kvalitej=la tri ecoj। তাই ব'লে আগ্নেয়তা অর্থে fajrecoর বদলে কিন্তু fajrkvalito বলা চলে না। ফাইর্‌ক্‌বালিতো উচ্চারণের মুশকিল তার একমাত্র কারণ নয়—ও বাধাটা চ'লে যায় fajrokvalito করে দিলেই। ব্যাপারটা হলো, fajrkvalito মানে 'আগ্নেয়তা' নয়, অন্য মানে—'আগুনের গুণ বা উৎকর্ষ'। Kvalito এখানেও তার দস্তুরমতো শব্দমর্যাদা বজায় রাখছে। Ecoর মতো নিছক প্রত্যয়ের কাজ সে করবে না। র‍্যানে এ দিকে নজর রেখেছিলেন। Kvalito সর্বদাই স্বতন্ত্র বিশেষ্য। Eco স্বতন্ত্র শব্দ রূপে ব্যবহৃত হ'লে সেই রকম, নইলে সে অস্বতন্ত্র বিশেষ্য—বিশেষ্যজাতীয় প্রত্যয়।

র‍্যনে দ্য সোস্যুরের তত্ত্বের আসল উপাদানগুলো আপনাদের দেখা হয়ে গেছে। পদের অঙ্গেরা তিন শ্রেণীর : বিভক্তি, প্রত্যয়, শব্দ। শ্রেণীদের মধ্যে 'যাতায়াত' আছে এই অর্থে যে, কোনো কোনো প্রত্যয় (যেমন ec) বিভক্তিদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত (bruo থেকে brua হয়ে brueco), এবং অনেক প্রত্যয় দস্তুরমতো শব্দের কাজ করতে পারে (ema, eco)। যে কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় শব্দ জাতি বিশেষের নাগরিক। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া—এই তিন প্রধান জাতিকে নিয়েই র‍্যনে ভেবেছেন সবচেয়ে বেশি। তিন জাতির মধ্যে পদের যাওয়া আসা ঘটে বিভক্তি পালটে এবং দরকার মতো প্রত্যয় জুড়ে।

পদের ভিতরে এই যে সংসার, এর বর্ণনা দিতে গিয়ে র‍্যনে লক্ষ্য করেছিলেন যে অঙ্গে অঙ্গ জুড়ে পদ তৈরির কাজটার সঙ্গে পদে পদ অন্বিত ক'রে বাক্যবন্ধ রচনার আংশিক মিল আছে, কিন্তু বিরাট তফাত। মিল আর তফাত দুটোই দেখবেন এই দৃষ্টান্তে :

(৭) tagnokto তাগনোক্তো 'এক-দিন-এক-রাত, পুরো (চব্বিশ ঘণ্টার) দিন

(৮) tago kaj nokto তাগ কাই নোক্তো 'দিন আর রাত'

দু' জায়গাতেই দিনবাচক আর রাতবাচক কথা জুড়ে 'দিন আর রাত'-বাচক কথা বানানো যাচ্ছে, এটাই মিল। আর তফাত এইখানে, (৭)-এর অর্ধস্ফুট tag উপাদান (৮)-এ গিয়া tago অর্থাৎ বিভক্তিওয়ালা পদ হিসাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, তাকে তাই বিশেষ অন্বয়ী শব্দ kaj 'আর' যতক্ষণ rokto-র সঙ্গে না বাঁধছে ততক্ষণ সে ধরা দেবে না।

এই উদাহরণটুকু দেখে হয়ত পুরো ধরতে পারলেন না পদের ভিতরকার সংসারের নিয়ম আর পদে পদে সহকর্মের নিয়ম কতটা আলাদা (৯)-(১০) দেখুন : (৯) metal simila মেতাল সিমিলা 'ধাতুসদৃশ' (১০) simila al metalo সিমিলা আল মেতালো, 'ধাতুর মতো'

এবার খালি যে metal এর বদলে metalo হচ্ছে আর তাকে similaর সঙ্গে অন্বিত করার জন্যে al আসছে তাই নয়, 'ধাতু' আর 'সদৃশ' কথা-দুটোই (৯) থেকে (১০)-এ যেতে জায়গা বদলাচ্ছে। ধাতুবাচক শব্দের স্থান (৯)-এ প্রথম কিন্তু (১০)-এ দ্বিতীয়। দেখুন কত তফাত পদের সঙ্গে বাক্যবন্ধের। তার কারণ, বাক্যবন্ধে সবাই পদ। কেউ কারও কথা শুনতে

বাধ্য নয়। প্রত্যেকে বিভক্তির তকমা এঁটে স্বমর্যাদায় ঘুরছে ফিরছে। ছোটো ছোটো অব্যয়রা এক পদকে আরেক শব্দের সঙ্গে অন্বিত ক'রে দেয়। কিন্তু পদের ভিতরে শাসনটা অনেক বেশি বজ্র বজ্র টাইপের—এক অংশের খাতিরে আরেক অংশ; অসম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করছে এটাই রেওয়াজ। তফাত তাই। আর মিল এইজন্যে যে, হাজার হোক সমাসও জোটবাঁধা কথা, বাক্যবন্ধও তাই। জোট বাঁধার কিছু কিছু নিয়ম তো সমান হবেই।

র‍্যানের ভাবনায় খুঁটিনাটি নিয়ে এর চেয়ে বেশি কথা বলার দরকার দেখছি না। ওঁর সঙ্গে ফেয়ারদিনাঁর কাজের তুলনার দুয়েকটা সূত্র ধরিয়ে দিই বরং।

ফেয়ারদিনাঁ সব ভাষার ন্যূনতম নির্বিশেষ গুণাবলীর কথা বলতে গিয়ে যদৃচ্ছা আর বৈচিত্র্যের ওপর এত জোর দিয়েছিলেন যে বাক্য আর পদের সংস্থানবর্ণনা তো দূরের কথা, সংজ্ঞার্থই তাঁর তত্ত্বে দাঁড় করানো যায় নি। (পদের বেলায় এটা আরম্ভেই স্পষ্ট ছিলো, বাক্যের বেলায় স্পষ্ট হয় পরে)। র‍্যানে তার বদলে বিশ্লেষণ দিয়েছেন একটা ভাষার—নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ভাষা এস্পেরান্তোর। সেই বিশ্লেষণে পদের আর বাক্যবন্ধের বিষয়ে যেসব খবর পাওয়া গেলো তা খুবই উন্নত নির্বিশেষ খবর। ১৯৮০তে অনেকে গবেষণা করছেন যাঁরা সেসব খবর শুনলে স্বীকার করবেন যে র‍্যানের তত্ত্ব আমাদের যুগের চেয়েও উন্নত।

দু জাতি যখন বাণিজ্যসূত্রে যুক্ত হ'তে গিয়ে এক জাতির কথায় আরেক জাতির ব্যাকরণ মিশিয়ে, ভেঙে, বাণিজ্যিক বা বাজারি বুলি তৈরি করে, এবং পরে সেই বুলি কোনো সম্প্রদায়ের দস্তুরমতো ভাষায় পরিণত হয়, তখন সেই প্রাক্তন বাজারি ভাষাকে বলে ক্রিওল। এস্পেরান্তোকে কেউ কেউ বলেছেন ঘরে ব'সে বানানো ক্রিওল। যেকোনো ক্রিওলেই ব্যাকরণের গঠন খুব পরিষ্কার দেখায়, কারণ যোগাযোগের তাগিদে অনেক ফালতু উপাদান ঝ'রে গিয়ে খালি যারা জরুরি তারাই বাকি থাকে। এস্পেরান্তোতেও এই সুবিধেটা আছে। সেইজন্যে এস্পেরান্তো বিশেষ ভাষা হ'লেও সেখানে খুঁড়লে এমন সব তত্ত্ব মেলে যার সাহায্যে আরো অনেক ভাষার পদওয়ালা যাবতীয় ভাষার—ব্যাকরণের নানা সমস্যার অল্পবিস্তর সুরাহা হ'তে পারে। এটা র‍্যানের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

স্বতঃস্ফূর্ত জন্ম নেয় যেসব ক্রিওল তাদের মতোই এস্পেরান্তোও বাক্যবন্ধ

আর পদের তফাত সযত্নে রক্ষা করেছে। অথচ দেখতেই পাচ্ছি সমস্ত উটকো উপদ্রব ঝেড়ে ফেলতে পারলেই ক্রিওলের শান্তি। ফেয়ারদিন্ঁার তত্ত্ব যদি যথেষ্ট হতো, যদৃচ্ছরূপ একা কথাদের জোট বাঁধার একত্রতায় সাম্যে মেলানো সূত্রই যদি ভাষার আসল কথা হতো, তাহলে তো ঠিক ক্রিওলদেরই হওয়া উচিত ছিলো এমন ভাষা যেখানে পদ ব'লে কিছু থাকবেই না, যেখানে শব্দে শব্দ জুড়লে পদ হচ্ছে না বাক্যবন্ধ হচ্ছে জিগেস করবারই কোনো মানে হবে না। অথচ তা কিন্তু নয়। মারাঠী ভাষাকে ক্রিওল ভাবেন কেউ কেউ; মারাঠীতে পদ আর বাক্যবন্ধের খুবই তফাত।

ভাষাকে ফেয়ারদিন্ঁার তত্ত্বে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া ছিলো, ততটা সে ব্যবহার করে না। রোগা লোককে মোটা লোকের আলখাল্লা পরিয়ে কী লাভ? তার চেয়ে বরং ফেয়ারদিন্ঁার শিক্ষার সঙ্গে র‍্যনের শিক্ষাও গ্রহণ ক'রে বলি, কোনো কোনো কথা পদ, পদ তৈরির জন্য বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া এই তিন জাতি আর শব্দ প্রত্যয় বিভক্তি এই তিন শ্রেণীর হস্তক্ষেপ লাগে—কোনো ভাষায় অল্প, কোনো ভাষায় বিস্তর। একা পদেরা জোট বাঁধলে বাক্যবন্ধ হয়, তাদেরও বাঁধনে আইন আছে, অন্য রকম আইন।

একা কথাটি ফুরোলো, জোটের গাছটি মুড়োলো।

সর্গে গোলযোগ

১ অনুসর্গ আর পূর্বসর্গ

দু ধরনের সর্গ আছে। অনুসর্গ বসে ডান দিকে। পূর্বসর্গ বাঁ দিকে। প্রায়ই দেখি বাংলা অনুসর্গের তরজমা ইংরেজি পূর্বসর্গ। যেমন, বাড়িটার পিছনে, বিহাইণ্ড দ্য হাউস। পিছনে অনুসর্গের অনুবাদ বিহাইণ্ড পূর্বসর্গ।

২ ইংরেজিতে পূর্বসর্গ

ইংরেজির বিশেষজ্ঞরা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, ওই ভাষাতে পূর্বসর্গ অনুসর্গ দুইই নাকি আছে। অনুসর্গের এই-সব দৃষ্টান্ত দেন—ডীটেল্‌জ্‌ অ্যাসাইড, ডীটেল্‌জ্‌ অ্যাপার্ট, খুঁটিনাটি বাদ দিলে। দীজ় অবজেকশন্‌জ্‌ নটউইথস্ট্যাণ্ডিং, এ-সব আপত্তি সত্ত্বেও। অ্যাসাইড অ্যাপার্ট নটউইথস্ট্যাণ্ডিং ছাড়া আর বোধহয় দৃষ্টান্ত নেই। এটা মজার ব্যাপার যে তিনটেরই মানে একই ধরনের। কল্পনা করুন বাংলা ভাষা থেকে তিনটে রেখে অন্য সমস্ত বিশেষণকে জলাঞ্জলি দেওয়া হলো। বাকি রইল খালি লম্বা, দীর্ঘ, ঢ্যাঙা। তা হলেও কি ওই তিনটের সুবাদে বলতে হবে যে বাংলায় বিশেষণ ব'লে একটা জাতি আছে? কী জানি। অন্তত ইংরেজিতে অনুসর্গ জাতির অস্তিত্ব বোধহয় না মানলেও চলে। ওই পদবন্ধগুলোর অন্য ব্যবস্থা করা যায়।

ওয়েদার প্যারমিটিং, দি ওপেন-এয়ার প্লে, উইল গো অন। এখানে প্যারমিটিং অনুসর্গ নয় নিশ্চয়ই। অনেকেরই মনে হবে ওটা এক ধরনের বিশেষণ। কথাটা যেন, উইথ ওয়েদার প্যারমিটিং, উইথ ওয়েদার অন আওয়র সাইড।

তেমনি ভাবতে পারি, দীজ় অবজেকশন্‌জ্‌ নট উইথস্ট্যাণ্ডিং মানে, উইথ দীজ় অবজেকশন্‌জ্‌ নট রিজিস্টিং, নটউইথস্ট্যাণ্ডিং। একটা উহ্য উইথ আগে আছে। এবং নটউইথস্ট্যাণ্ডিং বিশেষণটা দীজ় অবজেকশন্‌জ্‌-কে বিশেষিত করছে। তা হলে ডীটেল্‌জ্‌ অ্যাসাইড / অ্যাপার্টেও আগে রয়েছে উহ্য উইথ, আর ডীটেল্‌জ্‌কে বিশেষিত করছে অ্যাসাইড বা অ্যাপার্ট বিশেষণ।

এই নতুন বিশেষণ-বিশ্লেষণের পক্ষে দুটো যুক্তি আছে। অর্থাৎ ইংরেজিভাষী মহলে চালু অনুসর্গ-বিশ্লেষণের বিপক্ষে।

প্রথম কথা, বিশেষণ-বিশ্লেষণটা যথেষ্ট বিশ্বাস্য ঠেকছে। এতে ক'রে উপান্তের সোজাসুজি গোছালো বর্ণনা পাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, এটা জার্মানের সঙ্গে ইংরেজির তফাত বুঝতে সাহায্য করে। জার্মানে সত্যি সত্যি দু রকম সর্গই রয়েছে—পূর্বসর্গ, অনুসর্গ। ফলে বেশ কয়েক ধরনের মানেওয়ালা অনুসর্গ পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে বিশেষণ ভাবতে লোভ হয় না। যেমন, ডের স্ট্রাসে এণ্টলঙ 'রাস্তাটা ধ'রে'। ইংরেজিতে যে মনে হয় অনুসর্গদের ক্ষেত্র এত অদ্ভুতভাবে সংকুচিত তার কারণ অনুসর্গ আসলে নেইই। বিশেষণ দিয়ে ওর কাছাকাছি শুনতে বাগ্‌বিন্যাস করা চলে। এই পর্যন্ত।

৩. বাংলায় অনুসর্গ

তা হলে মনে তো হচ্ছে ইংরেজি ভাষা পূর্বসর্গ নিয়েই আছে। বাংলায় কি শুধু অনুসর্গ আছে? নাকি দুয়েকখানা পূর্বসর্গও খুঁজে পাই?

অনেকের ধারণা 'বিনা' পূর্বসর্গ। বিনা নালিশে আর উইদাউট কমপ্লেণ্ট তা হলে তুলনীয়। বিনা মাইনেয়, উইদাউট পে। বিনা দ্বিধায়, উইদাউট হেজিটেশন।

এই ধারণার অন্তত দুটো বিকল্প হতে পারে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা দরকার।

এক, বিনাকে উপসর্গ ভাবতে পারি। উপসর্গ আলাদা শব্দ নয়—বৃহত্তর শব্দের প্রথম অংশ। নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে নির্বিচারে নিঃশর্তে নিঃশব্দে নীরবে নিষ্কারণে ('কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে। নিষ্কারণে')—এগুলো দেখে কেউ তো বলে না, 'নির্ ভয়ে' মানে উইদাউট ফিয়র, নির্ হলো উইদাউটের মতো পূর্বসর্গ। নির্‌কে উপসর্গই বলে। তা হলে বিনা কেন পূর্বসর্গ হবে?

দুই, বিনাকে ভাবতে পারি বিশেষণ। কম খরচে কম মাইনেয় কম পরিশ্রমে—এ-সব দেখে তো কেউ কমকে পূর্বসর্গ বলতে যায় না। কমকে বিশেষণই বলে। বিনা কেন পূর্বসর্গ তাহলে?

প্রশ্ন দুটোর কেউ এই উত্তর দিতে চাইতে পারে যে, সর্গ হিসেবেই বিনার ব্যবহার আছে। যেমন, কারণ বিনা কার্য হয় না। এখানে বিনাকে

অনুসর্গ বলাই সমীচীন। কাছেই 'বিনা কারণে'-র বিনাকে পূর্বসর্গ বলতে দোষ কী ?

যদি বা বিনা—অনুসর্গের অস্তিত্ব মানি, তাতেও কিন্তু 'বিনা—পূর্বসর্গ' ব্যাপারটার স্থবিধে হয় না। বলতে পারি, গুরুতর কারণ বিনা গুরুতর কার্য হয় না ; কিন্তু 'বিনা গুরুতর কারণে গুরুতর কার্য হয় না' বলুন দেখি ? অবাংলা-অবাংলা শুনতে। অথচ বিনা ব'লে একটা পূর্বসর্গ যদি থাকে তা হ'লে তো ঐ বাক্যে কোনো ভুল নেই। 'বিনা গুরুতর কারণে' শুনতে অদ্ভুত, এ থেকে বোঝা যায় যে বিনা, আর যাই হোক, পূর্বসর্গ নয়। উপসর্গ বা বিশেষণ হলেও হ'তে পারে।

উপসর্গ না বিশেষণ ? উপসর্গ বলার পক্ষে যুক্তি মন্দ না। 'বিনামূল্যে' কথাটাকে তো অনেকে একটা শব্দ হিসেবেই লেখে। বিনাপয়সায় আর বিনিপয়সায় যে তুল্যমূল্য এতেও মনে হয় শব্দাংশের অর্থাৎ উপসর্গের কলাকৌশল। বিশেষণ বলার পক্ষে যুক্তি একটাই। বিনা কালো টাকায়, বিনা হলদে কাগজে, এ জাতীয় কথা বলা সম্ভব। অথচ দুই শব্দের জোটের গায়ে তো উপসর্গ সাঁটা যায় না। এ যুক্তিটার জোর অপেক্ষাকৃত কম ; কিন্তু একেবারে শূন্য নয়। বিনা হয়তো উপসর্গ আর বিশেষণ দুই কাজই করে। উপসর্গের কাজে বেশি মন দেয়। তবে লক্ষ্য করা ভালো যে বিনা যদি আদৌ বিশেষণ হয় তা হ'লে একলাসেরে বিশেষণ। অন্য বিশেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে চায় না। বলতে পারি না 'কম বা বিনা টাকায়', বলতে অস্থবিধে হয় 'বিনা বা কম টাকায়'।

মোটের উপর বিনা আর যে কাজই করুক পূর্বসর্গের কাজ করে না। পূর্বসর্গের কাজের জন্যে আর-কোনো উমেদারের কথা জানা নেই। নিরাপদেই বলা চলে বাংলায় পূর্বসর্গ নেই তা হ'লে। অনুসর্গই সর্বেসর্বা।

৪. শাসনক্ষমতা

অনুসর্গজোটে ক্ষমতার লড়াই জমে ওঠে। এ কথাটা বুঝতে চাইলে প্রথমে শাসনক্ষমতা আর অন্যজাতীয় জোট নিয়ে দু-একটা কথা ভেবে নেওয়া দরকার।

বিশেষ্যজোটের শাসক হচ্ছে বিশেষ্য। বিশেষ্যজোটই বা কাকে বলে, শাসনক্ষমতাই বা ঠিক কী জিনিস ?

বিশেষ্যজোট হ'লো এমন জোট বা মোর্চা যাতে অন্তত একটা বিশেষ্য সামিল থাকে—

মানুষের উপর মানুষের পাশবিক উৎপীড়ন
মানুষের উপর মানুষের উৎপীড়ন
মানুষের উপর পাশবিক উৎপীড়ন
পাশবিক উৎপীড়ন
উৎপীড়ন

এ পাঁচটাই বিশেষ্যজোটের দৃষ্টান্ত। এমন-কি শেষেরটাও, নিছক উৎপীড়ন শব্দটাও, বিশেষ্যজোটের কাজ করতে পারে। যেমন, বিশেষ্যজোটের একটা কাজ বাক্যের কর্তা হওয়া। 'উৎপীড়ন যখন আসে একা আসে না' এই বাক্যে তো উৎপীড়ন কথাটাই কর্তা। সেই সুবাদে সে তাহলে বিশেষ্য-জোট ব'লে গণ্য। জোটটার একমাত্র সদস্য উৎপীড়ন—বিশেষ্য, এই পর্যন্ত। ঠিক যেমন একজনের কমিশন হ'তে পারে তেমনি এক শব্দের জোটও সম্ভবপর।

শাসনক্ষমতা কী জিনিস? দেখতেই তো পেলেন যে বিশেষ্যজোটে একা থাকতে পারে বিশেষ্য। ওকে না হ'লে চলে না। কাজেই ও-ই শাসক। এটা এক ধরনের শাসকতা। শাসনের একটা দিক।

এটুকু বলা যথেষ্ট না। ইংরেজি 'দ্য টাস্ক'-এর মতো বিশেষ্যজোটের কথা ভাবুন। ওর চেয়ে তো ছোট করা যায় না। 'আই লাইক টাস্ক' বা 'টাস্ক ইজ্ ঈজি' ইংরেজি নয়। তবে কী বলবো ওরকম জোটে শাসক নেই অথবা উপস্থিত সবাই শাসক? শাসনের আর কোনো লক্ষণ নেই? আছে বৈকি। শাসক থাকলেই শাসিত রয়েছে। অন্তত তিন রকম শাসিত—নির্দেশক পূরক বর্ধক। নির্দেশকের ব্যাপারটা গোলমেলে। এখানে পূরক আর বর্ধকের কথা বলি।

পূরক তার শাসকের অপূর্ণ অর্থকে পূর্ণ করে। অজিত লণ্ঠনটা টুলের উপর রাখল। অজিত রাখল এটুকু বললে কী রকম যেন শোনাত। কী রাখল কোথায় রাখল এ দুই প্রশ্নের অন্তত একটার জবাব জানা ভালো। রাখল-র একটা পূরক তা হলে লণ্ঠন। আরেকটা পূরক টুলের উপর। কিন্তু কখন রাখল সেটা যেন বাড়তি খবর। অজিত বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটা টুলের উপর রাখল, এই বাক্যে 'বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে'-টা রাখল-র আবশ্যিক পূরক নয়, ঐচ্ছিক বর্ধক।

যে জিনিস পূরক বর্ধক নিতে পারে সে শাসক। 'দ্য টাস্ক'-এর টাস্ক শব্দটা তো তা হলে শাসক। সহজেই বলতে পারেন, দ্য ডিফিকাল্ট টাস্ক অভ রিকনস্ট্রাকশন। ডিফিকাল্ট এখানে টাস্কের বর্ধক। অর্থাৎ না বললেও চলত। অভ রিকনস্ট্রাকশন কথাটা পূরক। না বললে ঠিক বোঝা যেত না কী টাস্ক কী বৃত্তান্ত।

এই সূত্রে একটা কথা তুলি। বর্ধক বা পূরক 'নেওয়া' ব্যাপারটার অন্যতম লক্ষণ হলো যথাক্রমে প্রতিফলন আর উপফলন। প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বাংলায় বড় একটা নেই। তবে যখন পুরুষদের সুন্দর আর মেয়েদের সুন্দরী বলি তখন 'সুন্দরী নায়িকা'-র মতো বিশেষ্যজোটে বর্ধক 'সুন্দরী'-র লিঙ্গ প্রতিফলন করছে শাসক 'নায়িকা'-র। সেইজন্যে শাসক বর্ধকের লিঙ্গ সমান। উপফলন আরেকটু সূক্ষ্ম জিনিস। একদিকে দেখুন, রাম শ্যামকে দোষ দেয়, যদু মধুকে অসম্মান করে। অন্যদিকে, রাম শ্যামের ভুল ধরে, যদু মধুর মুণ্ডুপাত করে। তফাত হচ্ছে কেন? কেন বলি না 'রাম শ্যামের দোষ দেয়' অথবা 'রাম শ্যামকে ভুল ধরে'? প্রথম দফায় এর জবাব উপফলন। 'সুন্দরী'-র স্ত্রীলিঙ্গ দেখানো দীর্ঘ-ঈ-টা যদি 'নায়িকা'র -প্রতিফলন, তাহলে, 'শ্যামকে দোষ দেয়'-এর ওই 'শ্যামকে'-র 'কে'-টা 'দোষ দেয়'-এর উপফলন। প্রতিফলন উপফলন দুটোই শাসিত কর্তৃক শাসকের হুকুম তামিল করা। তফাত এই যে, কোনো কিছু (যেমন স্ত্রীলিঙ্গ) প্রতিফলিত হলে তখন সেটা শাসক আর শাসিত দুয়েই হাজির থাকে, আর যেটা উপফলিত হলো সেটা খালি শাসিতেই হাজির, শাসকের শরীরে নয়। 'মধুর মুণ্ডুপাত করে'-তে 'মুণ্ডুপাত করে'-র উপফলন হিসেবেই 'মধু'-তে ষষ্ঠী বিভক্তি 'র' রয়েছে। তাই ব'লে নিশ্চয়ই ভাববেন না যে 'মুণ্ডুপাত করে'-র ভিতরেও একখানা ষষ্ঠী বিভক্তি ছিল বা আছে যে এজন্যে দায়ী। আরেকটা তফাত —প্রতিফলন বর্ধকের ধর্ম, উপফলন পূরকের। তবে অবশ্যধর্ম নয়। 'শেষ নায়িকা'-র 'শেষ' বর্ধক। কিন্তু তার গায়ে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার কোনো প্রতিফলনী গয়না নেই। 'রাম নাটক ভালোবাসে'-তে 'নাটক' কথাটা 'ভালোবাসে'-র পূরক। কিন্তু কোনো দৃষ্টিগোচর উপফলন ঘটছে না এখানে।

বর্ধক কিছু করলে প্রতিফলনই করবে। পূরক কিছু করলে উপফলনই করবে। এইভাবে বোধহয় ভাবা চলে।

এ পর্যন্ত শাসকের তিনটে লক্ষণ দেখেছি। জোটে একা থাকতে পারে

অনেক শাসক। সব শাসক পূরক নিতে পারে—উপফলন যার ধর্ম। সব শাসক নিতে পারে বর্ধক, যার ধর্ম প্রতিফলন। চতুর্থ লক্ষণও আছে। শাসক সংযুক্ত হ'তে জানে। স্বজাতীয় কারুর সঙ্গে মিলে সহশাসন করতে পারে। যেমন, দ্য ডিফিকাল্ট টাস্ক অর বার্ডেন, এখানে টাস্ক সংযুক্ত হচ্ছে স্বজাতীয় অর্থাৎ বিশেষ্য-জাতীয় বার্ডেনের সঙ্গে। দুজনে মিলে শাসন করছে বর্ধক ডিফিকাল্টকে আর নির্দেশক দ্য-কে।

সতর্ক পাঠকের প্রশ্ন : কঠিন অথবা জরুরি কাজ, এই বিশেষ্যজোটে তো কাজ শব্দটাই বিশেষ্য, শাসক। অথচ এখানে দেখছি অশাসক বর্ধক দুটো দিব্যি সংযুক্ত হয়ে বসেছে—কঠিন-এর সঙ্গে জরুরি। শাসক না হয়েও এরকম মিলল কী ক'রে?

প্রশ্নটা তোলার দরকার ছিল।—কঠিন অথবা জরুরি, এটা একটা বিশেষণজোট। এর বর্ধক হ'তে পারে 'যথেষ্ট'—যথেষ্ট কঠিন অথবা জরুরি। এখানে যথেষ্টকে কঠিনও শাসন করছে জরুরিও। বিশেষণজোটের ভিতরে বিশেষণই শাসক। যথেষ্ট কঠিন অথবা জরুরি, এই বিশেষণজোটে 'কঠিন' আর 'জরুরি' সহশাসক। সমান শাসনশক্তির জোরেই এ দুই বিশেষণ হাত মেলাতে পারে। আস্ত বিশেষণজোটটা অবশ্য 'কাজ'-বিশেষ্যের বর্ধক। বিশেষ্যজোটে বিশেষ্যই শাসক, বিশেষণজোট বর্ধক। সেখানে বিশেষণজোট শাসক নয়, নেহাতই শাসিত। কিন্তু 'অথবা'-সংযোজক কাজ করছে তো বিশেষণজোটের ভিতরেই, বিশেষ্যজোটে নয়। 'অথবা'-বিশেষণজোটের ভিতরে শাসক 'কঠিন'-এর সঙ্গে শাসক 'জরুরি'-কে জুড়ছে। আস্ত বিশেষণ-জোটটা বিশেষ্যের শাসিত হ'লোই বা।

এবার অনুসর্গজোটের কথায় ফিরে যাই।

৫. অনুসর্গজোটের গদি

বিশেষণজোটে বিশেষণ শাসক। বিশেষ্যজোটে বিশেষ্য শাসক। এর নড়চড় হয় না। তা হলে তো মনে হয় যে অনুসর্গই গদিতে বসবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী। তা কিন্তু সবসময় হয় না।

বাড়িটার সামনে, এই অনুসর্গজোটে নিশ্চয়ই 'সামনে' অনুসর্গই শাসক। এবং 'বাড়িটার' তার পূরক। পূরক-সুলভ উপফলনও আছে ; ওই যে ষষ্ঠী বিভক্তি 'র'। কী ক'রে জানছি যে 'সামনে' শাসক ? প্রথম কথা, অনায়াসে

বর্ধক নিতে পারে : বাড়িটার একদম সামনে। তাছাড়া, স্বজাতীয় অনুসর্গের সঙ্গে সংযুক্ত হতে জানে : বাড়িটার সামনে বা পিছনে। দস্তুরমতো শাসক। একাও থাকতে পারে : 'সামনে অপেক্ষা করছে ওরা' বলা সম্ভব।

দেবলের জন্যে, এই অনুসর্গজোটে কিন্তু 'জন্যে' শাসক নয়। বর্ধক হয় না—বলুন দেখি, দেবলের একদম **জন্যে**, দেবলের ঠিক **জন্যে**, দেবলের একেবারে **জন্যে**? একা থাকতে পারে না—'জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা' এরকম বাক্য অকল্পনীয়। সংযুক্তিও অচিন্ত্য। দেবলের জন্যে বা দেবলের বিষয়ে কোনো চিঠি নেই, এটা ছেঁটে বলতে পারি না, দেবলের জন্যে বা বিষয়ে কোনো চিঠি নেই। (আমার কানে 'দেবলের বিষয়ে বা জন্যে' আরো বেশি শ্রুতিকটু। তবে তফাতটা সূক্ষ্ম। দুটোই বেশ অবাংলা।)

তবু মনে হয়, কোনো কোনো দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের মতোই 'জন্যে'-রও নেই-নেই ক'রেও একটা যেন শাসকসুলভ লক্ষণ বাকি আছে। ওর হুকুমেই যেন 'দেবলের' পদের ষষ্ঠী বিভক্তি 'এর' হচ্ছে—পূরক-সুলভ উপফলন। শাসক থাকলে তবেই না পূরণ, উপফলন?

উপফলনের ব্যাপারটা আরো কাছে গিয়ে দেখলে চমকে উঠতে হয়। বাংলায় বিশেষ্যের চার রকম বিভক্তি হয়—কিছু না (প্রথমা), 'কে' (দ্বিতীয়া), '(এ)র' (ষষ্ঠী), 'এ/তে' (সপ্তমী)। চারটেই অনুসর্গের উপফলনবশত দেখা দিতে পারে—

দিল্লী হয়ে
রামকে দিয়ে (রামের দ্বারা অর্থে)
দিল্লীর বিষয়ে
হাতে ক'রে

কিন্তু, অবাক কাণ্ড, অনুসর্গ যখনই সর্বগুণান্বিত আসল শাসক, তখনই দেখি উপফলনের বিচিত্র খামখেয়াল বন্ধ, সব সময় ষষ্ঠী বিভক্তি! বাড়ির সামনে, পিছনে, ওপরে, নীচে, আগে, পরে, পক্ষে, বিরুদ্ধে—যতগুলো আসল শাসক অনুসর্গ দেখি সবাই ষষ্ঠী নেয়। তবে যারা ষষ্ঠী নেয় তারা সবাই আসল শাসক নয়—যেমন 'জন্যে' বা 'চেয়ে' তো ষষ্ঠী নেয় কিন্তু অন্যান্য বিচারে অশাসক। অথচ, উপফলনে যদি খামখেয়োলই না রইলো তা হ'লে শাসক হয়ে লাভটা কি? আর অন্য দিকে, যে অনুসর্গগুলো খামখেয়ালিভাবে উপফলন ফলাচ্ছে চার রকম, তাদেরই বলবো অশাসক?

দু-এক ক্ষেত্রে অবশ্য মনে হয়, আমরা যে ধরনের অনুসর্গকে অশাসক ভাবছি তার কাছ থেকে যেন তার আপাতপূরক বিশেষ্যজোট কেড়েই নিয়েছে শাসনক্ষমতা। যেমন, আমরা যে 'এটা নিয়ে আলোচনা কোরো না'-র বিকল্পে 'এটা আলোচনা কোরো না' বলতে পারি, এই তথ্যের যদি কোনো অর্থ থাকে তাহ'লে তা এই যে 'এটা নিয়ে' জোটের যে সদস্য একা দাঁড়াতে পারে এবং দাঁড়িয়ে গোটা জোটের হয়ে কাজ করতে পারে সে হলো বিশেষ্যজোট, 'এটা'। তেমনি, 'রাম আর শ্যামের মধ্যে ঝগড়া হবে' আর 'রাম শ্যামের ঝগড়া হবে' যে প্রায় একই কথা, তা দেখেও মনে হয়, 'রাম আর শ্যামের মধ্যে' এই বৃহত্তর জোটে শাসকের গদিতে 'রাম আর শ্যামের' বিশেষ্যজোটটাই আসীন। এবং স্বতন্ত্র পরীক্ষা করলেই (বর্ধক নেয় কিনা ইত্যাদি) দেখতে পাবেন যে এই 'মধ্যে' বা 'নিয়ে' স্পষ্টতই অশাসক অনুসর্গ।

এই দু-এক ক্ষেত্রের এজাহারের উপর কতটা নির্ভর করবো ঠিক করা শক্ত। এক্ষুনি যে বললাম 'এজাহারের উপর', এই 'উপর' নিয়ে একটু ভাবুন।

মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ
মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ

এ দুটো মোটামুটি সমান তো? তাহ'লে এখানে খালি 'উপর' অশাসক তাই নয়, তার সঙ্গীই শাসক? এবার—

এজাহারের উপর নির্ভর করবো
?? এজাহারে নির্ভর করবো

কী রকম যেন লাগে 'এজাহারে নির্ভর করবো' বলতে। এখানে কি তাহ'লে 'উপর'-এর সঙ্গী শাসক নয়? অথচ 'উপর' এখানেও অন্যান্য বিচারে অশাসক—বর্ধক টর্ধক নেয় না। নেয় না কোনো কোনো স্থানবাচক প্রয়োগেও—

ছাদের উপর ব'সে আছে
?? ছাদের ঠিক উপর ব'সে আছে

কিন্তু যেই বলি 'উপরে', অমনি ঠিক হয়ে যায়—

ছাদের উপর ব'সে আছে
ছাদের ঠিক উপরে ব'সে আছে

এই দৃষ্টান্তটা অর্থের দিক থেকে একটু অদ্ভুত হয়ে গেল, অনবধান মার্জনীয়। কিন্তু অন্য পরীক্ষা করলেও এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় যে, স্থানবাচক 'উপরে' শাসক, কিন্তু অ-স্থানবাচক 'উপরে' অথবা কোনো কিছু-বাচক 'উপর' অশাসক। আর 'মানুষের উপর বিশ্বাস'-এ 'মানুষ'ই বোধহয় শাসকতা ছিনিয়ে নেয়।

সুতরাং খানিক আগে যে উপফলনের বৈচিত্র্যের কথা তুলে প্রশ্ন করে-ছিলাম আপাত-অশাসক অনুসর্গগুলো আসলে শাসক কিনা, সে-প্রশ্নের 'না' উত্তরের পক্ষেই তো যুক্তির ওজন ভারী ব'লে মনে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বর্ধক-পরীক্ষা আর সংযুক্তি-পরীক্ষা নিয়ে গবেষণা ক'রে বাংলা-দেশের গবেষিকা রশীদা বেগম দেখেছেন যে এই দুই পরীক্ষার ফল প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান। অশাসক অনুসর্গ যাদের ভাবছি তারা সত্যিই বোধহয় অশাসক। এর ফলে কোনো-কোনো অনুসর্গবিশিষ্ট জোটে শাসন-ক্ষমতা চ'লে গেছে অন্য সদস্যের হাতে। যে-সব জোটে তা যায়নি, বা গেছে ব'লে একটুও প্রমাণ নেই, সেগুলোকে কি অরাজক ভাববো? বাংলায় যে জাতীয় সর্গ চালু, অনুসর্গ, তার এই শাসন নিয়ে অমীমাংসার বা অস্থিরতার ব্যাপারটা ঠিক কী? এর উত্তর কি অন্য কোনো ভাষা ঘাঁটলে পাওয়া যাবে? নাকি, কোনো প্রাসঙ্গিক, জরুরি তথ্য নজর এড়িয়ে যাচ্ছে যা চোখে পড়লে আমাদের সব নিরানব্বই একশো হয়ে যাবে? (এ কথাটা আধুনিক কবিতার লাইন থেকে চুরি করা।)

কারক : দুঃস্বপ্নের আসান

এক

ইস্কুলে যে বাঙলা ব্যাকরণ পড়ানো হয় সে ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বাঁচবার একটাই উপায় আছে। সে হ'লো জেগে ওঠা। লাফ মেরে তড়াক ক'রে জেগে ওঠার কথা বলছি না। স্বপ্নের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। সে কাজ করতে চাইলে খালি ধৈর্য আর পরিশ্রমই লাগে না, সাহসও লাগে।

গতানুগতিক ব্যাকরণের বই বাঙলার যে সব জিনিস নিয়ে কথা বলে না, ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সেগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভব, এবং সে রকম বিশ্লেষণ করলে নতুন স্পষ্টতা পাওয়া যায়, এ কথা এখন অনেকেই জানেন। এককেটা সমস্যা তুলে ধ'রে নতুন নতুন প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের বইয়ে যেসব দিকের কথা বলা আছে সেগুলোরও যে ঠিকমতো আলোচনা নেই, সেগুলোর বেলাতেও যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতা আনতে পারে, এটা দেখাবার জন্যে এই নিবন্ধে এমন এক বিষয় বেছে নেওয়া হয়েছে যা ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের অন্যতম বিভীষিকা—বিশেষ্যের বিভক্তি, কারক, আর 'কেস'।

দুই

উনিশ শতকের নবজাগরণের পরিধি আর প্রকৃতি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে নানা মহলে। নবজাগরণের যেসব ফসল এ যুগের সমাজজীবনে র'য়ে গেছে তার মধ্যে এখনকার প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণ অন্যতম। সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ নিবন্ধের বিষয় নয়। কে কবে কী করেছেন সেসব সংগত প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে এটুকুই বলি যে নবজাগরণের মনীষীরা আমাদের ভাবতে শিখিয়ে গেছেন যে বাঙলা শব্দরূপ বুঝতে চাইলে দরকারি তাত্ত্বিক সরঞ্জাম ধার নিতে হবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ঐতিহ্য থেকে, কিন্তু র'য়ে-স'য়ে, কারণ বাঙলা বিশেষ্যের বিভক্তি কম। ওঁরা কারক আর বিভক্তির তত্ত্ব ছেঁটে নিয়েছিলেন, কতকটা ইংরেজি ব্যাকরণের দেখাদেখি।

এই ছেঁটে-নেওয়া তত্ত্বের নিজস্ব কোনো লজিক নেই ; সংস্কৃত আর ইংরেজির একটা জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। এর ফলে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী আজ ইংরেজি ব্যাকরণও বোঝেন না, বাঙলা ব্যাকরণের সংস্কৃত-অবলম্বী দিকটাও বোঝেন না। এবং ব্যাকরণ বিষয়টার নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন। নবজাগরণের প্রধান পুরুষেরা কোনো ভাষারই শব্দরূপ নিয়ে তলিয়ে ভাবেননি। জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়েছেন। সেই মহৎ জিনিস আমাদের দেশের ইস্কুলে ইস্কুলে শেখানো হয় যাতে ছেলেমেয়েরা গোঁজামিল দিতে শেখে।

আসল মুশকিলটা এই যে আমাদের বড় বড় মনীষীরা সংস্কৃত ঐতিহ্যের কর্তা আর কর্মের সঙ্গে ইংরেজি ঐতিহ্যের সাবজেক্ট আর অবজেক্টের তফাত বুঝতে পারেন নি।

সংস্কৃত ঐতিহ্যের কর্তৃকারক আর কর্মকারকের সঙ্গে পশ্চিমী ঐতিহ্যের কোনো ধারণার সহজ সমীকরণ হয় না। পশ্চিমী ব্যাকরণচিন্তায় কারক ব'লে কিছু নেই। তার বদলে ওদের আছে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট। এগুলো কারক নয়; এগুলোকে ওরা আজকাল বলে গ্র্যাম্যাটিকাল ফাংশন। এই প্রয়োগে 'গ্র্যাম্যাটিকাল ফাংশন' কথাটার প্রতিশব্দ হিসেবে 'ধেয়' চলতে পারে। অন্যত্র ('ভাষা' মে-অক্টোবর ১৯৮৩, বর্ষ ২ সংখ্যা ২ পৃষ্ঠা ২৪) অবজেক্ট-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'অবধেয়' ব্যবহার করেছি ; সে প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, আর সাবজেক্ট যদি 'অভিধেয়' বলতে রাজী হই, তাহলে শব্দগুলো মনে রাখা সহজ হবে। ধেয় দাঁড়াবে দু ধরনের, অভিধেয় (সাবজেক্ট) আর অবধেয় (অবজেক্ট)। মনে করার কারণ আছে যে অনেকে যাকে বিধেয় বা প্রেডিকেট বলেন সেটাও এইজাতীয়।

কারক আর ধেয় কী জিনিস তা যদি বুঝে নেন তাহলে আর ভুল ক'রে ভাববেন না 'জিনিস-দুটো একই, কর্তা মানে অভিধেয়, কর্ম মানে অবধেয়'। জানবেন যে কর্তা কর্ম ইত্যাদি কারকের সঙ্গে অভিধেয় বা অবধেয়র সরাসরি তুলনা করা অসংগত।

বিশদ আলোচনা একটু পরে করবো। সেই আলোচনায় 'অভিধেয়' শব্দেরও ব্যাখ্যা থাকবে। আপাতত কাজ চালানোর জন্যে ধ'রে নিন, যে জিনিসের পুরুষ বচন ইত্যাদি ক্রিয়ার প্রতিফলিত হয় সে হ'লো ক্রিয়ার অভিধেয়, আর ক্রিয়াকাণ্ডের যে দায়িত্বশীল সাধনকারী সে হ'লো কর্তা।

তফাতটা স্পষ্ট হয় দুটো ইংরেজি বাক্যের কথা ভাবলে (বাঙলার কথায় পরে আসছি)—

1. *The ambassador* (কর্তা এবং অভিধেয়) has withdrawn those statements.

2. *Those statements* (অভিধেয়) have been withdrawn *by the ambassador* (কর্তা)

দুটো বাক্যেই প্রত্যাহারকারী হলেন কর্তা, 'রাষ্ট্রদূত'। প্রত্যাহার কাজটা তিনিই করছেন। এটা ১ থেকে ২-এ যেতে পালটে যায় না। কিন্তু প্রথম বাক্যের ক্রিয়ায় 'রাষ্ট্রদূত'-এর একবচনের প্রতিফলন চাই ; তাই 'হ্যাজ'। আর ২-এর ক্রিয়ার প্রতিফলিত 'ওই বিবৃতিগুলো'-র বহুবচন ; তাই 'হ্যাভ'। ২-এ 'ওই বিবৃতিগুলো' অভিধেয় (সাবজেক্ট)। ১-এর অভিধেয় 'রাষ্ট্রদূত'। ১-এর কর্তৃবাচ্য বা অ্যাকটিভ ভয়েস থেকে ২-এর কর্মবাচ্যে বা প্যাসিভ ভয়েসে যেতে কারক বদলায়নি (কর্তা একই আছে) কিন্তু ধেয় বদলেছে (অভিধেয় এক নেই)।

এবার এই প্রসঙ্গের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা মুলতুবি রেখে অন্য কথা তুলি। বিভক্তি আর কেস কাকে বলে ? এই প্রশ্নের সূত্রেই আমরা ফিরে আসবো ধেয় আর কারকের কথায়।

তিন

বিভক্তি শব্দটার সংকীর্ণ প্রয়োগও আছে, ব্যাপক প্রয়োগও আছে। ব্যাপক প্রয়োগই এখনকার বাঙলা ব্যাকরণে প্রচলিত। যেমন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ (কলকাতা : বাক্-সাহিত্য, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৭২) আছে, 'যাহা নাম-শব্দ বা ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া পদ গঠন করে, তাহাকে বলে বিভক্তি (Termination)' (পৃ ৫২)। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : 'লোকে', 'লোকেরা', 'লোককে'-র 'এ', 'রা', 'কে' হচ্ছে শব্দ-বিভক্তি, আর 'পড়ি', 'পড়ে', 'পড়েন'-এর 'ই', 'এ', 'এন' হলো ক্রিয়া-বিভক্তি।

কিন্তু বিভক্তি শব্দটার সংকীর্ণ প্রয়োগও আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণচর্চার ঐতিহ্যে অনেকেরই চেনা 'বিভক্তি'-র এই সংকীর্ণতর অর্থ, যে অর্থে বলা হয় যে সংস্কৃত শব্দরূপে (সম্বোধনপদ না ধরলে) সাতটা বিভক্তি ছিল,

প্রথমা দ্বিতীয়া থেকে শুরু ক'রে ষষ্ঠী সপ্তমী পর্যন্ত। ভেবে দেখুন, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় না ব'লে কেন প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ রূপের ব্যবহার? তার কারণ, সংস্কৃতে 'বিভক্তি' স্ত্রীলিঙ্গ, এবং এই স্ত্রীলিঙ্গেরই প্রতিফলন দেখি 'প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া' ইত্যাদিতে।

এই সংকীর্ণ প্রয়োগে 'বিভক্তি' কথাটার মানে আর ইংরেজি ব্যাকরণে 'কেস' কথাটার মানে একই। ব্যাপক আর সংকীর্ণ অর্থের তফাতটা স্পষ্ট হবে যদি আমরা বিখ্যাত 'নরঃ নরৌ নরাঃ' ছকের দু ছত্র দেখে নিই।

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	নরাৎ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নরস্য	নরয়োঃ	নরাণাম্

এর মানে মোটামুটি এই :

পঞ্চমী	লোকটার থেকে	লোক-দুটোর থেকে	লোকগুলোর থেকে
ষষ্ঠী	লোকটার	লোক-দুটোর	লোকগুলোর

'মোটামুটি' বলছি তার কারণ, সংস্কৃত পঞ্চমী আর ষষ্ঠীর নানারকম প্রয়োগ আছে, তার সবগুলো এই বাঙলা অনুবাদের সঙ্গে মেলে না। যাই হোক, মানেটা জরুরি নয় এখানে। প্রশ্ন হচ্ছে, কটা বিভক্তি আছে?

ব্যাপক অর্থে 'বিভক্তি' এখানে ছটা। নর-শব্দের গায়ে আৎ, আভ্যাম্ এভ্যঃ, স্য, য়োঃ, আণাম্—এই ছটা জিনিস বসছে। এগুলো ছটা আলাদা জিনিস, এই কথাটা বোঝাবার জন্যে এগুলোকে 'ছটা বিভক্তি' বলা ছাড়া গতি নেই। 'বিভক্তি' শব্দটার এই ব্যাপক প্রয়োগ বজায় না রাখলেই নয়।

সংকীর্ণ অর্থে 'বিভক্তি' এখানে ছটা নয়, মাত্র দুটো—পঞ্চমী বিভক্তি আর ষষ্ঠী বিভক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পঞ্চমী বিভক্তির তিন চিহ্ন অর্থাৎ আৎ আভ্যাম্ এভ্যঃ একই জিনিসের তিন চিহ্ন—এদের বচন-ঘটিত বিভিন্নতা অবান্তর। পঞ্চম 'কেস' একটাই জিনিস।

'বিভক্তি'-র এই সংকীর্ণ প্রয়োগ তুলে দিলে হয়; তাতে পরিভাষার আর চিন্তার স্পষ্টতা বাড়বে। এই অর্থে 'বিভক্তি'-র বদলে 'কেস' বলা চলে, ইংরেজি শব্দ ধার নিতে চাইলে। তা না চাইলে নতুন কোনো পারিভাষিক শব্দ চালু করতে হবে। কী শব্দ? 'কেস' মানে ঠিক কী?

'কেস' এসেছে লাতিন 'কাসুস' থেকে। 'কাসুস' লাতিন বৈয়াকরণদের অবদান নয়। গ্রীক ব্যাকরণে ছিল 'প্তোসিস'; তার আক্ষরিক লাতিন

অনুবাদ করা হয়েছিল 'কাসুস'। 'প্তোসিস' বা কাসুসের বাঙলা করা যায় 'প্রপাত' (জলপ্রপাতের 'প্রপাত'), ঠিক যেমন এর জার্মান করা হয়েছে 'ফাল্'। প্তোসিস, কাসুস, ফাল্—সবগুলোর মানে একই : প্রপাত, প'ড়ে যাওয়া।

জানতে চাওয়া স্বাভাবিক—এ ধারণাটার সঙ্গে প'ড়ে যাওয়ার সম্পর্ক কী ? গ্রীক বৈয়াকরণরা 'প্তোসিস' বলেছিলেন কেন ? আমরাই বা কেন রাজি হবো 'প্রপাত' বলতে ?

চার

৩। কেনিয়া রামবাবুর বাসভূমি

৪। রামবাবু কেনিয়াকে অপছন্দ করেন

৫। রামবাবু কেনিয়ার নাগরিক হ'তে চান না

৬। রামবাবু কেনিয়ায় থাকেন

এখানে দেখছি, বাঙলায় কেনিয়া শব্দটার চার প্রপাত—পুরনো হিসেব মাফিক প্রথম প্রপাত (কেনিয়া), দ্বিতীয় প্রপাত (কেনিয়াকে), ষষ্ঠ প্রপাত (কেনিয়ার), সপ্তম প্রপাত (কেনিয়ায়)। প্রশ্ন হ'লো, এ ব্যাপারটা কী ? এটা 'প্রপাত কেন বলব ?' প্রশ্নটারই রকমফের।

৩-এ 'কেনিয়া' প'ড়ে যায়নি, খাড়া দাঁড়িয়ে আছে অভিধেয় হ'য়ে ; তার বিধেয় 'রামবাবুর বাসভূমি'। কিন্তু ৪-এ 'কেনিয়াকে' হেলে পড়েছে, 'অপছন্দ করেন' এই ক্রিয়াপদের গায়ে হেলান দিয়েছে। ৫-এ 'কেনিয়ার' হেলান দিয়েছে 'নাগরিক'-এর গায়ে (সংস্কৃত ঐতিহ্যের ভাষায় 'কেনিয়ার' এখানে সম্বন্ধপদ হিসেবে 'নাগরিক'-এর সঙ্গে সংবদ্ধ)। ৬-এ 'কেনিয়ায়' কাত হ'য়ে প'ড়েই গেছে 'থাকেন'-এর সামনে। ৩-এর 'কেনিয়া' সোজা, কিন্তু ৪, ৫, ৬-এর 'কেনিয়া-কে,-র, -য়' কাত হ'য়ে পড়েছে নানা দিকে।

কতটা, কার দিকে, কাত হ'য়ে পড়েছে সেই হিসেবটাই হ'লো প্রপাত। প্রথম প্রপাত মানে আদৌ কাত না হওয়া। সপ্তম প্রপাত মানে একেবারে পতন ও মূর্ছা। দ্বিতীয় আর ষষ্ঠ প্রপাত এদের মাঝামাঝি।

জলের তাপমাত্রা তুলনীয়। সেলসিয়াসের শূন্য ডিগ্রীতে বরফ। এটা প্রথম প্রপাতের মতো। তাপ যখন সপ্তমে চড়ে তখন তাপমাত্রা একশো ডিগ্রী সেলসিয়াস। জল তখন বাষ্প। এটা সপ্তম প্রপাতের অনুরূপ। 'কতটা

গরম ?' এ প্রশ্নের উত্তর যেমন 'আদৌ গরম নয়, শূন্য ডিগ্রি' হতে পারে, তেমনি 'কতটা কাত ?' এ প্রশ্নেরও উত্তর হ'তে পারে 'একটুও না, প্রথম প্রপাত'।

এজন্যেই ৩-এর কাত-না-হওয়া 'কেনিয়া'-ও প্রপাত-প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য। তাকে বলতেই হবে 'প্রথম প্রপাত, কাত হইনি, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি।'

বাকীদের তো কথাই নেই। কেনিয়াকে, কেনিয়ার, কেনিয়ায়—তিন ধরনের কাত হ'য়ে পড়া। এই তিনটে পদই কোনো-না-কোনো শাসকের বশ্যতা স্বীকার করেছে। এদের শাসক যথাক্রমে 'অপছন্দ করেন, নাগরিক, থাকেন'।

বশ্যতা-অবশ্যতাকেই বলছিলাম কাত হওয়া না হওয়া। শাসন বলতে কী বোঝায় ? এ প্রশ্নের জবাব পাবেন আমার 'সর্গে গোলযোগ' নিবন্ধে। আশা করছি এমনিতেও খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিতে পারছেন। 'কেনিয়া' মানে কী,—এর উত্তর দেওয়া যায়, কারণ এ পদটা স্বাধীন, অশাসিত। কিন্তু 'কেনিয়াকে' মানে কী—আলাদা ক'রে এর কোনো উত্তর হয় না। বলতে হয় 'কেনিয়াকে অপছন্দ করেন' এই আস্ত বিধেয়টার মানে তৈরি করার কাজে 'অপছন্দ করেন' প্রধান কর্মী, 'কেনিয়াকে' তার অধস্তন সহকর্মী। এই কথাটাই আরেকভাবে বলা যায় : 'কেনিয়াকে'-র শাসক 'অপছন্দ করেন'।

অধীনতার স্বীকৃতিই হ'লো প্রপাত। অধীনতার রকমফের আছে এটা প্রপাতের বিভিন্নতার অন্যতম কারণ। স্বাধীনতাও এক ধরনের অধীনতা, তাই প্রথম প্রপাতও একটা প্রপাত।

পাঁচ

আমি দুই-এর শেষে কথা দিয়েছিলাম যে বিভক্তি আর কেস কাকে বলে এ প্রশ্নের সূত্রেই ফিরে আসবো ধেয় আর কারকের কথায়। এবার কথা রাখবো।

কেসকে প্রপাত বলতে রাজি হয়েছি এবং কয়েকরকম প্রপাতের খবর নিয়েছি। এও জেনেছি যে প্রপাতের দৃষ্টিগোচর চিহ্ন যে প্রত্যয় সেটা এক ধরনের বিভক্তি। কাজ চালানোর জন্যে আপাতত সংস্কৃত শব্দরূপের

দেখাদেখি প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রপাতের কথা বলেছি, যদিও এ গণনার কোনো বাস্তব বহিরাশ্রয় বাঙলায় নেই। কাজ চালানোর জন্যে প্রপাতকে বলেছি 'অধীনতার স্বীকৃতি', যদিও অধীনতার রকমফেরের কোনো স্পষ্ট তত্ত্ব পেশ করিনি।

সংস্কৃতঘেঁষা গণনা বর্জন ক'রে যদি প্রপাতগুলোর পাকা নাম চাই, এবং সেইসব নামের বিভিন্নতার পিছনে যদি কোনো তাত্ত্বিক অন্তরাশ্রয়ের সমর্থন চাই, তাহলে বিভিন্ন অধীনতা-রীতির যে তত্ত্ব গড়তে হবে সেটাই পশ্চিমী ব্যাকরণের থিওরি অভ গ্র্যাম্যাটিকাল ফাংশনৃজ্, যাকে বলে ধেয়তত্ত্ব। অভিধেয় (সাবজেক্ট) আর অবধেয় (অবজেক্ট) এই দুটো ধারণাই ধেয়তত্ত্বের প্রধান দুই খুঁটি। আপাতত ধ'রে নেওয়া যাক যে প্রথম-প্রপাত অভিধেয়-প্রপাত। দ্বিতীয়-প্রপাত অবধেয়-প্রপাত। ষষ্ঠ আর সপ্তম প্রপাতের ধেয়-প্রতিরূপ সম্বন্ধে যাতে কথা বলা যায় সেজন্যে দুটো নাম প্রস্তাব ক'রে রাখছি, যথাক্রমে উদ্ধেয় আর অনুধেয়। কিন্তু উদ্ধেয় আর অনুধেয় নিয়ে এ লেখায় স্পষ্ট কোনো আলোচনা থাকছে না। অভিধেয় আর অবধেয় নিয়ে ভাবা সবচেয়ে জরুরি এবং শক্ত। ৩ আর ৪ থেকেই রওনা দেওয়া যাক।

৩। কেনিয়া রামবাবুর বাসভূমি।

৪। রামবাবু কেনিয়াকে অপছন্দ করেন

৩-এ 'কেনিয়া' অভিধেয়। ৪-এ, ধ'রে নেওয়া যাক, 'কেনিয়াকে' অবধেয়। (এই বিশ্লেষণ অবশ্য প্রত্যাহার করবো সাত-এ, কিন্তু আগের কাজ আগে তো তুমি সারো / পরের কথা ভাবিও পরে আরো'।) কথাটা আরেকটু ভেঙে বলা দরকার। ক্রিয়াপদ জুড়লে ৩-এর চেহারা ৭ :

৭। কেনিয়া হচ্ছে রামবাবুর বাসভূমি

এখানে 'কেনিয়া'-র পুরুষ আর গৌরব প্রতিফলিত হচ্ছে ক্রিয়াপদে। যদি পুরুষ পালটাই—

৮। (হে কেনিয়া,) তুমিই হচ্ছ রামবাবুর বাসভূমি

—অথবা যদি গৌরব পালটাই—

৯। লুমুম্বা হচ্ছেন রামবাবুর আরাধ্য দেবতা

তাহলে 'হচ্ছে'-র বদলে 'হচ্ছ', 'হচ্ছেন' এইসব অন্য পুরুষ আর গৌরবের ধাতুরূপ এসে পড়ে। এইভাবে বুঝতে পারি যে ৭-এ 'কেনিয়া'-র সঙ্গে

'হচ্ছে' প্রতিফলন সম্বন্ধে অন্বিত। 'হচ্ছে' ক্রিয়াপদ 'কেনিয়া'-র পুরুষ (প্রথম পুরুষ) আর গৌরব (সামান্য গৌরব) প্রতিফলন করে।

ক্রিয়াপদ যদি কোনো বিশেষ্যের পুরুষ ইত্যাদি প্রতিফলন করে তাহলে সংস্কৃত ঐতিহ্যের পরিভাষায় বলে যে সেই ক্রিয়াপদ সেই বিশেষ্যকে 'অভিধান করছে' বা 'অভিহিত করছে'। এই কথাটার ঝোঁক একটু পালটে নিয়ে আমি বলছি যে সেই বিশেষ্য সেই ক্রিয়াপদের—এবং গোটা বাক্যের—'অভিধেয়'। এই বাবদে ৭, ৮, ৯-এ অভিধেয় যথাক্রমে কেনিয়া, তুমি, লুমুম্বা। ৩ মোটামুটি ৭-এরই মতো : তবে প্রকাশ্য ক্রিয়া নেই তো কী হয়েছে ; 'কেনিয়া'-ই অভিধেয়। ৪-এ অভিধেয় 'রামবাবু'।

৪-এ 'কেনিয়াকে' অবধেয়, এ কথা বলার মানে কী, অর্থাৎ অবধেয় কাকে বলে, এটা এবার খোলসা ক'রে বোঝাতে হবে।

ছয়

প্রথম দিকে লোভ হয় প্রপাত-বিভক্তির বহিরঙ্গ চেহারার সাহায্যেই কোনটা কোন ধেয় সেটা সাব্যস্ত করতে। সেভাবে চাইলে বলতে ইচ্ছে করে যে ৩-এ 'কেনিয়া'-র গায়ে বিভক্তি নেই (অথবা 'শূন্য বিভক্তি আছে', একই কথা), ৪-এ 'কেনিয়াকে'-র গায়ে 'কে'-বিভক্তি, এটাই আসল কথা। অভিধেয়র গায়ে বিভক্তি থাকে না। অবধেয়র লক্ষণ 'কে'-বিভক্তি। একথা বললে মুশকিল বাধায় ১০।

১০। লুমুম্বা উচ্ছে অপছন্দ করতেন

প্রতিফলনের এজাহার বলছে ১০-এ 'লুমুম্বা'ই একমাত্র অভিধেয়। অথচ 'লুমুম্বা' আর 'উচ্ছে' দুটোই বিভক্তিহীন অর্থাৎ বিভক্তিহীনতার জোরেই অভিধেয় হওয়া যায় এটা তাহলে ঠিক নয়। অভিধেয়র প্রপাতবিভক্তি নেই একথা বাঙলায় সত্যি। (এই লেখায় আমি ধ'রে নিচ্ছি যে যাঁরা বলেন 'পাগলে কী না বলে' বা 'আমার ওঁকে ভালো লাগে'-র 'পাগলে' বা 'আমার'-কে অভিধেয় বলা উচিত তাঁদের বক্তব্য তর্কসাপেক্ষ, অতএব এই ধরনের লেখায় বর্জনীয়। হ'তেই পারে যে ওঁরা ভুলই বলেছেন।) কিন্তু দৃষ্টিগোচর বিভক্তি ধারণ না করা সত্ত্বেও ১০-এ 'উচ্ছে' অভিধেয় হ'তে পারেনি।

১০-এর 'উচ্ছে' কি 'অপছন্দ করতেন'-এর অবধেয় ? কীসের জোরে বলবো ?

হয়ত ১০-এর সঙ্গে ৪-এর মিল নিয়ে কথা বলা উচিত। 'অপছন্দ করেন' আর 'অপছন্দ করতেন'-এর তফাত শুধু কালের, অভিধেয়-বিভিন্নতা একেবারেই নামমাত্র, ১০-এর 'উচ্ছে' আর ৪-এর 'কেনিয়াকে' একইভাবে ক্রিয়ার অধীন। এবার তাহলে হয়ত বলতে পারি 'কেনিয়াকে' অবধেয় কারণ তার গায়ে 'কে'-বিভক্তি, 'উচ্ছে' অবধেয় কারণ প্রয়োগ একই ধরনের। অবধেয় কিনা সেটা এইভাবে ঠিক করবো? তাহলে এর শেষ কোথায়?

১১। উনি তোমাকে সমর্থন করবেন

১২। উনি এ প্রস্তাব সমর্থন করবেন

১৩। উনি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন

১১-র 'তোমাকে' যদি অবধেয় হয় তাহলে প্রস্তাবিত নিরিখ মাফিক ১২-র 'এ প্রস্তাব' তো অবধেয় বটেই, এমনকি 'এর'-বিভক্তিধারী 'এ প্রস্তাবের'-ও ১৩-য় অবধেয়। এতদূর যেতে চাইবো কি? ভেবে দেখা দরকার। ১৪ কি ১৩-র মতো নয়?

১৪। উনি এ প্রস্তাবের বিরোধী

১৫। উনি এ প্রস্তাবের পক্ষপাতী

১৬। উনি এ প্রস্তাবে রাজি

১৪ থেকে ১৫ হ'য়ে কি আমরা ১৬-য় পৌঁছে যাই না 'অনুরূপ প্রয়োগ' খুঁজতে খুঁজতে? 'এ প্রস্তাবে'-র 'এ'-বিভক্তিও যদি অবধেয়-দশার লক্ষণ হয় তাহলে প্রপাতের সঙ্গে ধেয়তত্ত্বের সম্পর্কের আর কোনো মাথামুণ্ডু থাকবে কি?

অবধেয় সনাক্ত করার একরকম মুশকিল এই।

সাত

অন্য ধরনের মুশকিল হয় ১৭-য়।

১৭। আমরা জন্মদিনে ওকে রেকর্ড দেবো

এখানে অবধেয় কি 'ওকে' না 'রেকর্ড' না দুটোই? পশ্চিমী ঐতিহ্যে বলে, দুটোই; 'ওকে' গৌণ (ইনডিরেক্ট) অবধেয়, 'রেকর্ড' মুখ্য (ডিরেক্ট) অবধেয়। এরকম বলার কোন বৈধ যুক্তি জানি না। আমরা এখানে নতুন পরিভাষা এবং নতুন ধারণাতন্ত্র তৈরি করছি। পুরনো ওজন বওয়ার দরকার বোধ করি না। আমরা বলবো, ১৭-য় 'ওকে'

প্রতিধেয় (ইনডিরেক্ট অবজেক্ট) আর 'রেকর্ড' হ'লো অবধেয় (ডিরেক্ট অবজেক্ট)। অবজেক্ট বলতে এমনিতে ডিরেক্ট অবজেক্ট বোঝায়। প্রতিধেয়কে এক ধরনের অবজেক্ট ব'লে মনে করার কোনো কারণ নেই।

বাঙলায় প্রতিধেয়র অন্যতম লক্ষণ হ'লো 'কে'-বিভক্তির নিয়মিত উপস্থিতি :

১৮। ওরা সাহেবকে দেখেনি

১৯। ওরা সাহেব দেখেনি

২০। ওরা সাহেবকে ঘুষ দেয়

২১। *ওরা সাহেব ঘুষ দেয়

২১-এ তারকাচিহ্ন, অর্থাৎ বাঙলায় ওটা হয় না। ১৮-১৯-এ দেখছি যে 'সাহেবকে'-ও হয়, 'সাহেব'-ও হয় একটু অন্য অর্থে। কিন্তু ২০-২১ বলছে যে প্রতিধেয় হিসেবে কেবল 'সাহেব'-ই হয় ; 'কে'-বিভক্তি ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। ১৯-এর 'সাহেব' প্রতিধেয় নয়, অবধেয়।

খেয়াল করা ভালো যে ১৭ বা ২০-র মতো সম্প্রদানকারক হ'লে তবেই প্রতিধেয়, এমন নয় ! প্রতিধেয় পদের কারক অন্য হ'তে পারে :

২২। ওরা সাহেবকে ছাহেব বলে

২৩। *ওরা সাহেব ছাহেব বলে

২৩-এর অগ্রাহ্যতা দেখে বুঝতে পারছি যে ২২-এর 'সাহেবকে' প্রতিধেয়। কিন্তু ২২-এ 'সাহেবকে'-র সঙ্গে ক্রিয়ার যে অন্বয় তার সঙ্গে আর যারই থাকুক, সংস্কৃত ঐতিহ্যের সম্প্রদানকারকের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রতিধেয় ধারণাটার সাহায্যে ১৭-র মুশকিলটাকে সরিয়ে দেওয়া গেল। বলা গেল যে ওখানে 'রেকর্ড'ই একমাত্র অবধেয়। এবার ছয়-এর সমস্যায় হাত দেওয়া যাক।

খেয়াল করা ভালো যে ধেয়র তালিকায় এখন সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ :

২৪।	অভিধেয়	বিভক্তি : শূন্য
	অবধেয়	?
	প্রতিধেয়	-কে
	উদ্ধেয়	-এর
	অনুধেয়	-এ, -তে

বাঙলায় বিভক্তি মোট এই কটাই আছে ('থেকে', 'জন্যে', ইত্যাদি বিভক্তি নয়, অনুসর্গ)। অবধেয়র ভাগ্যে নতুন কেউ জুটবে না। অন্য কোনো ধেয়র সঙ্গে তাকে বিভক্তি ভাগ ক'রে নিতেই হবে।

আমরা দেখেছি যে ১৭-য় 'রেকর্ড' অবধেয় এ কথা মানলে সুবিধে। এও লক্ষ করেছি যে সেখানে তার বিভক্তি শূন্য। তবে কি বলবো এটাই নিয়ম ? অবধেয়র শূন্য বিভক্তি ? বলতে বাধা নেই, সত্যিই।

অভিধেয়রও বিভক্তি শূন্য এটা কোনো বাধা নয়, কারণ অভিধেয়র আরেকটা লক্ষণ এই যে ক্রিয়াপদ অভিধেয়র পুরুষ আর গৌরব প্রতিফলন করে (অবধেয়র বেলায় তা করে না)। আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে অবধেয়র অন্যতম লক্ষণ হ'লো (১) শূন্য বিভক্তি (২) ক্রিয়ার অপ্রতিফলন। এতে অন্তত ২৪-এর বাকী সব ধেয় থেকে অবধেয় আলাদা হ'য়ে যায় :

২৫।	অভিধেয়	শূন্য এবং প্রতিফলন
	অবধেয়	শূন্য
	প্রতিধেয়	-কে
	উদ্ধেয়	-এর
	অনুধেয়	-এ, -তে

২৫ মানতে তাহলে বাধা কী ? বলতে পারেন, বাধা এই যে ৪, ১১, ১৮-র 'কেনিয়াকে, তোমাকে, সাহেবকে' তাহলে আর অবধেয় থাকে না, প্রতিধেয় হ'য়ে যায়, যে সিদ্ধান্ত আমাদের বহু যত্নে লালিত বহুদিনকার অভ্যস্ত বিশ্লেষণের বিরোধী। কিন্তু এটা কোনো বৈধ যুক্তি নয়। ২২-এ দেখেছি যে প্রতিধেয় মানেই সম্প্রদানকারক নয়। ৪, ১১, ১৮-য় কর্ম-কারকের কোনো নড়চড় হচ্ছে না। কর্ম যথাক্রমে কেনিয়া, তুমি আর সাহেবই থাকছে। কারক বদলাচ্ছে না ; বদলাচ্ছে কেবল ধেয়র বিশ্লেষণ।

বদলাক না।

আট

কারকের কথা উঠেছে নিজে থেকেই, অন্তত সম্প্রদানকারকের কথা। কারক সংস্কৃত ঐতিহ্যে ছখানা : কর্তা কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ। আমাদের ভাবনার প্রধান বিষয় কর্তৃকারক আর কর্মকারক। এগুলোরই বাচ্য হয়, কর্তৃবাচ্য আর কর্মবাচ্য।

২৬। নরঃ ব্যাঘ্রং হন্তি

২৭। The man kills the tiger

২৮। নরেণ ব্যাঘ্রঃ হন্যতে

২৯। The tiger is killed by the man

২৬ আর ২৭ এ কর্তৃবাচ্য, অর্থাৎ এখানে ক্রিয়াপদ কর্তাকে লোকটাকে বাচিত বা অভিহিত করে, কর্তাই এখানে বাচ্য বা অভিধেয়। ২৮ আর ২৯-এ কর্মবাচ্য ; ক্রিয়াপদের রূপ পালটে গিয়ে ক্রিয়াপদ কর্মকে, বাঘটাকে বাচিত করে। কর্মটাই বাচ্য বা অভিধেয় হ'য়ে দাঁড়ায় তাই।

দৃষ্টান্তগুলো ইচ্ছে ক'রেই সংস্কৃত আর ইংরেজি থেকে দিলাম। বাঙলার কথায় পরে আসছি। সংস্কৃতে স্পষ্ট কর্মবাচ্য আছে ব'লেই কর্মকারক ধারণাটা সহজে তৈরি হ'তে পেরেছে সংস্কৃত ব্যাকরণচর্চার ঐতিহ্যে।

একথা সত্যি যে সংস্কৃত ঐতিহ্যে কর্তা, আর কর্মের প্রচলিত সরকারি সংজ্ঞার্থ এই যে, কর্তা হ'লো 'স্বতন্ত্র' আর কর্ম হ'লো 'ঈপ্সিততম'। এগুলো তাৎপর্যতাত্ত্বিক সংজ্ঞার্থ, এবং সুষ্ঠু নয়। কিন্তু প্রয়োগের বেলায় দেখা যায় যে বৈয়াকরণরা কার্যত বাচ্যের কথাই ভাবছেন, রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য বা ঈপ্সার কথা না ভেবে।

সম্প্রদানবাচ্য নেই, তাই সম্প্রদানকারকের প্রচলিত সংজ্ঞার্থ ই একমাত্র সম্বল : সম্প্রদানকারক হ'লো, কর্তা 'কর্মণা যম্ অভিপ্রৈতি' সেই ব্যক্তি বা জিনিস ; অর্থাৎ কর্তার দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যক্তি বা জিনিসকে উদ্দেশ ক'রে কর্মটা যাচ্ছে—যার উদ্দেশে কর্মটা ছুঁড়ে বা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি বা সেই জিনিস। যেমন ১৭-য় কর্তা 'আমরা', কর্ম 'রেকর্ড'। কর্ম যথারীতি ক্রিয়ার সঙ্গে, 'দেবো'-র সঙ্গে, ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। 'আমরা ওকে রেকর্ড দেবো'-তে 'ওকে' স্পষ্টতই সেই লোক যাকে কর্তা, আমরা, রেকর্ড দেওয়ার কাজটার মাধ্যমে যেন ছুঁতে চাচ্ছি, সেই লোক যার সঙ্গে কর্মটাকে (রেকর্ডটাকে) সেতু হিসেবে ব্যবহার ক'রে সংযোগসাধন করতে চাচ্ছি। সন্দেহ নেই যে 'কর্মণা যম্ অভিপ্রৈতি', 'কর্মের দ্বারা যাকে ইনটেণ্ড বা ইণ্ডিকেট করে', সম্প্রদানকারকের এই সংজ্ঞার্থে মুনসিয়ানা আছে ভালোই।

সংস্কৃতে সম্প্রদানকারকে চতুর্থ আর ষষ্ঠ প্রপাতের বিভক্তি ব্যবহৃত হ'তো (যাদের সঙ্গে বাঙলা প্রতিধেয়-প্রপাতের এবং উদ্ধেয়-প্রপাতের মিলও আছে তফাতও আছে)। এ ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বুঝে নেওয়া দরকার।

নয়

সংস্কৃত যে যুগে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণে সন্নীত বা স্ট্যানডারডাইজড় হ'লো, যার পর থেকে পাণিনীয় ঐতিহ্যের ব্যাকরণের সাহায্যেই সংস্কৃত শেখার রীতি চালু হ'লো উচ্চবর্ণীয় মহলে, সেই যুগের আগেই সংস্কৃতের মৌখিক ভাষাভিত্তি প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা সাধারণ লোকের স্বাভাবিক কথাবার্তার প্রবাহে আর ব্যবহৃত হচ্ছিলো না।

পাণিনির সময় খৃষ্টপূর্ব তিনশো মতন। খৃষ্টপূর্ব ছশো নাগাদ আর্যাবর্তে নাস্তিক (বেদবিরোধী) বৌদ্ধ আর জৈন চিন্তা উঠে এসেছিল। আজ যে বৌদ্ধ আর জৈন দলিল পাওয়া যায় তাতে পালি আর অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষার প্রাধান্য। এ দলিলগুলোর বর্তমান আকৃতি অবশ্য পরবর্তী শতাব্দীর ভাষায় সংগ্রথিত। কিন্তু মনে করা হয় যে বুদ্ধ আর মহাবীরের সময় থেকেই নাস্তিক নেতারা সাধারণ লোকের মধ্য ভারতীয়-আর্য মৌখিক ভাষাতেই কাজ করতেন। বৈদিক ধর্মের ঐতিহ্যের এবং তার অনুষঙ্গী রাজশক্তির পোষাকী সংস্কৃত ভাষা বর্জন করতেন।

স্পষ্টতই সংস্কৃতের কথ্য রূপ, যাকে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য বলি সেইসব উপভাষা, তখনই আর স্বাভাবিক কথ্য ভাষা নেই। ভাষার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অনিবার্য নিয়মে তার যুগ শেষ হ'য়ে গেছে এবং তার পরের পর্বের সূচনা হয়েছে, যাকে বলা হয় মধ্য ভারতীয়-আর্য পর্ব, যার তিন উপপর্ব পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ।

মধ্য ভারতীয়-আর্য পর্বের প্রথম উপপর্বেই দেখি যে চতুর্থ প্রপাত মিশে গেছে ষষ্ঠ প্রপাতের মধ্যে (এটা আরো বড়ো পরিবর্তনের সামান্য অংশ মাত্র, কিন্তু সে কথা এখানে নয়)। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয়-আর্য চতুর্থ প্রপাত (নরায় 'লোকটাকে', পিতরে 'বাবাকে') উঠে গেছে এবং তার জায়গা নিয়েছে প্রাচীন ষষ্ঠ প্রপাতের (নরস্য 'লোকটার', পিতুঃ 'বাবার') মধ্য ভারতীয়-আর্য চেহারা (যেমন নরস্য-র পালি রূপ নরস্স)। প্রাচীন আর্য শব্দরূপে সম্প্রদানকারকের আলাদা ক'রে যেটুকু স্পষ্ট স্বীকৃতি ছিলো, মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় তা আর রইলো না।

বলা বাহুল্য, এই বদল রাতারাতি হয়নি। এর প্রস্তুতি চলছিল প্রাচীন ভারতীয়-আর্য পর্বেই। পাণিনির সন্নীত (বেঁধে দেওয়া) আদর্শ সংস্কৃতে যদি আমরা ঐতিহ্যের রক্ষণশীলতার কল্যাণে পাণিনির তিন-চার

শতাব্দী আগেকার প্রাচীন ভাষার অবিকৃত চেহারা পেতাম তাহলেও আশা করতাম যে তাঁর সূত্রে সম্প্রদানকারকে চতুর্থী আর ষষ্ঠী দুই বিভক্তিরই নির্দেশ থাকবে। কারণ চতুর্থীরা অনেকেই ষষ্ঠীর দিকে রওনা দিয়েছিল আগেই। কিন্তু পাণিনি-বর্ণিত ভাষা সম্ভবত তাঁর স্থানকালের ব্রাহ্মণদের মার্জিত প্রয়োগের ভাষা, এবং তার ওপর স্বভাবতই তখনকার সাধারণ লোকের মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষারও প্রভাব পড়েছিল। ফলে চতুর্থ প্রপাতের ক্ষয় হয়েছিল আরোই। এতে পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছিল তা খানিকটা আন্দাজ করা যায় পাণিনির বর্ণনা থেকে।

পাণিনি বলেছেন যে দানার্থক ক্রিয়া যদি একেবারে দিয়ে দেওয়া বোঝায়, স্বত্বত্যাগ বোঝায়, তাহলে সম্প্রদানকারকে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এ ছাড়া নানা ক্রিয়ার তালিকা দিয়ে পাণিনি বলেছেন, এই এই ক্রিয়ার বেলায় সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তি।

পদের চেহারার রকমফেরের সঙ্গে তাৎপর্যের পরিবর্তনের সম্বন্ধ নিয়ে অবশ্য বৈয়াকরণরা মাঝে মাঝে এমন সূক্ষ্ম কথা ব'লে থাকেন যার তথ্যসমর্থন অল্প অথবা আদৌ নেই। যেমন আমাদের যুগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ ১৭৬) বলেছেন—'লক্ষণীয়: 'আ' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও 'ইবা'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের অর্থে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে; যেমন: (১) 'পড়ার বই'=পাঠের বই, পড়নের বই (a book for reading); 'পড়িবার বই'=পঠিতব্য বই (a book to be read, a book which should be read)। (২) "চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে" (রবীন্দ্রনাথ)—এস্থলে 'হুকুম মানা'র=হুকুম পালনের; হুকুম মান্য বা পালনীয়, এরূপ কোনো ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন নাই, কেবল 'মানা'-রূপ ক্রিয়া-ব্যাপারটি বুঝাইতেছে; কিন্তু 'দেশকে উদ্ধার করবার'=দেশ-উদ্ধার রূপ কর্তব্য সম্পাদনের; এক্ষেত্রে কেবল ক্রিয়া-ব্যাপারটি নহে, ক্রিয়া-ব্যাপারটি যে কর্তব্য তাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে।'

সুনীতিবাবু অবশ্য এর তিন ছত্র বাদেই স্বীকার করেছেন যে 'অবশ্য সাধারণত প্রয়োগে উপরি-উক্ত দ্বিবিধ পার্থক্য মানিয়া চলা হয় না; একের স্থানে অপরের প্রয়োগ, অভিন্ন অর্থে দুইয়ের প্রয়োগ, হইতে দেখা যায়'।

সুনীতিবাবুর ব্যক্তিগত বৈঠকী আধুনিকতা ওঁর কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নিয়েছে।

অবশ্য উনি এটা না বললেও আমারা বাঙলাভাষী হিসেবে জানি যে 'করবার' আর 'করার' অতটা আলাদা বা ওভাবে আলাদা নয়, স্পষ্ট কোনো তাৎপর্যভিন্নতা নেই এ দুই রূপের। কিন্তু পাণিনির যুগে শিষ্ট কথাবার্তার ভাষা ঠিক কী রকম ছিল এবিষয়ে আমরা পাণিনির নিজের সাক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই জানি না। এবং পাণিনি সুনীতিবাবু নন যে রাশ টেনে পর-মুহূর্তেই একটু আলগা করতে রাজি হবেন। ফলে আমরা জানি না, কোনো দিন জানতে পারবোও না, সম্প্রদানে ষষ্ঠ আর চতুর্থ প্রপাতের উপস্থিতি সম্বন্ধে পাণিনি যা বলেছেন তা তাঁর মহলের মৌখিক ভাষায় সত্যিই হ'তো কিনা।

না হয় মেনেই নিলাম যে ঠিকই বলেছেন। (তবে পাণিনির বিবরণের তথ্যযাথার্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা সম্ভব সে কথা মনে রাখা ভালো।) তারপর ?

দশ

আশা করি বুঝতে পারলেন ছবিটা কী দাঁড়ালো।

৩০। রজকস্য দেহি বস্ত্রং — ৩১। ধোপাকে দাও কাপড়

৩২। দরিদ্রায় অন্নং দেহি — ৩৩। গরিবকে খাবার দাও

৩১-এর সংস্কৃত ৩০ ; এখানে দান আছে কিন্তু স্বত্বত্যাগ অর্থাৎ একেবারে দিয়ে দেওয়া নেই ; তাই চতুর্থ প্রপাতের 'রজকায়'-র বদলে পাই ষষ্ঠ প্রপাতের চেহারা 'রজকস্য'। ৩৩-এর সংস্কৃত ৩২। এখানে আছে স্বত্বত্যাগ। তাই এখানে 'দরিদ্রস্য' নয়, 'দরিদ্রায়'।

লক্ষ করুন যে প্রপাতের তফাত আছে কিন্তু কারকের তফাত নেই। 'রজকস্য' আর 'দরিদ্রায়' দুটোই সম্প্রদান-কারকের দৃষ্টান্ত, যদিও 'রজকস্য-র রূপ ষষ্ঠ প্রপাতের আর 'দরিদ্রায়' চতুর্থ প্রপাতের।

পাণিনি-বর্ণিত সংস্কৃতের ছবিটা তাহলে এই।

যে কারণেই হোক, বাঙলা ব্যাকরণের ঐতিহ্যে সকলেই এ ছবিটা ভুল বুঝেছেন, এবং ভুলটা কেউ শুধরে দেয়নি। শোধরাবার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু 'দেরি হোক, যায়নি সময়'। তাই এখানে এত খুঁটিনাটি সমেত ব্যাপারটা উপস্থাপন করলাম।

বাঙলা ব্যাকরণের যাবতীয় বইয়ে বলা হ'য়ে আসছে যে 'স্বত্ব ত্যাগ করিয়া কিছু দান করাকে বলে "সম্প্রদান"। বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে এইরূপ দান-ক্রিয়ার পাত্রকে বুঝায়, তাহাকে বলি "সম্প্রদান-কারক"' (সুনীতিবাবুর বই, পৃ ৮৮)। তা না হ'লে নাকি গৌণ কর্ম। '"ধোপাকে কাপড় দাও": এখানে "দেওয়া"-অর্থে কাচিতে দেওয়া বুঝাইতেছে, স্বত্বত্যাগ-পূর্বক দান বুঝাইতেছে না; সুতরাং "ধোপাকে"—পদটিকে সম্প্রদান-পদ বলা যাইবে না, ইহা গৌণ কর্ম' (তদেব)।

স্পষ্টতই এই উপস্থাপন ভুল।

বাঙলা ব্যাকরণজিজ্ঞাসার পথিকৃৎ মনীষীরা 'মুখ্য কর্ম' আর 'গৌণ কর্ম' ধারণা-দুটো তৈরি করেছিলেন স্পষ্টতই ইংরেজি ডিরেক্ট অবজেক্ট আর ইন-ডিরেক্ট অবজেক্টের দেখাদেখি। অর্থাৎ ওঁরা ভেবেছিলেন, 'কর্ম' মানে 'অবজেক্ট'; এবং যেহেতু ইংরেজিতে 'গিভ দ্য ওয়াশ্যরম্যান দীজ ক্লোদ্জ'-এ 'দ্য ওয়াশ্যরম্যান'-কে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বলা হয় সেহেতু বলা চলে যে 'ধোপাকে' পদটা গৌণ কর্ম। এই গোটা চিন্তাধারাটাই ভুল।

সুনীতিবাবু ৮৯-৯০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এই প্রসঙ্গে রামমোহন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। দীর্ঘতম উদ্ধৃতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এক প্রবন্ধ থেকে। সেই উদ্ধৃতির একাংশ—সংস্কৃতে 'উপসর্গপূর্বক ক্রুধ্-ধাতু ও দ্রুহ্-ধাতুর সম্প্রদান কর্ম হইয়া যায়। ক্রীড়ার্থক দিব্-ধাতুর করণ-কারকে বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা পায়। কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে। যদি বিভক্তি-চিহ্নের খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কর্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে দানক্রিয়ার সম্প্রদানকে কর্মসংজ্ঞা দিলে এমন কী অপরাধ হইবে?' অর্থাৎ সম্প্রদান-কারক তুলে দিয়ে গৌণ কর্ম বললেই তো হয়। এই বক্তব্য দেখে বোঝা যায় যে এঁরা কেউই বোঝেন নি সংস্কৃতে কর্মকারক আর সম্প্রদানকারকের তফাতের মোদ্দা কথাটা ঠিক কী। সকলেই ভেবেছেন নেহাত দ্বিতীয় আর চতুর্থ প্রপাতের ব্যাপার। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন 'সাধারণতঃ কর্মে দ্বিতীয়া আর সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দিষ্ট আছে।'

স্পষ্টতই এঁরা ভেবেছেন যে 'সাধারণত' কারক আর 'বিভক্তির' (প্রপাতের) একটা সহজ প্রতিষঙ্গ মনে রাখলেই চলে, যে প্রতিষঙ্গের ছক সংস্কৃতে ৩৪। অর্থাৎ এঁরা সংস্কৃত কর্তাকে ইংরেজি সাবজেক্টের (অভিধেয়র)

সঙ্গে আর সংস্কৃত কর্মকে ইংরেজি অবজেক্টের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন ; কারককে ভেবেছিলেন ধেয় ; অন্যসব ভুলের সূত্রপাত এই ভুলেই। ওরা ভেবেছিলেন ৩৪কে একটু ছেঁটে নিয়ে বাঙলা ব্যাকরণে ব্যবহার করলেই হবে। (অবশ্য কর্তার ব্যাপারে রামমোহন ভুল করেননি। কিন্তু কর্মের ব্যাপারে উনি যা বলেছিলেন তার সঙ্গে সংগতি রেখে ওঁর পরবর্তীরা যে ৩৪-এ পৌঁছেছেন এতে অবাক হ'তে পারি না।)

৩৪। সুনীতিবাবু, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহনের ধারণা :

কারক	প্রপাত
কর্তা	প্রথম
কর্ম	দ্বিতীয়
করণ	তৃতীয়
সম্প্রদান	চতুর্থ
অপাদান	পঞ্চম
অধিকরণ	সপ্তম

কেউ যদি ৩৪ বিশ্বাস করেন, এবং তার পর যদি শেখেন যে পাণিনির মতে স্বত্বত্যাগপূর্বক দানের পাত্রের বেলাতেই চতুর্থ প্রপাত হয় (৩০ আর ৩২ এর তফাত মনে রাখবেন), তাহলে তিনি ভাবতেই পারেন যে স্বত্বত্যাগ না হলে সম্প্রদান-কারক হয় না। এই ভাবাটা ভুল ; এর গোড়ায় গলদ ; ৩৪ ছবিটাই ভুল।

৩৪ কত বড় ভুল, কী রকম মারাত্মক ভুল তা বুঝতে চাইলে জেনে নিতে হবে প্রধান তিন বাচ্যের গতিপ্রকৃতি—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য।

এগারো

২৬। নরঃ ব্যাঘ্রং হন্তি	২৮। নরেণ ব্যাঘ্রঃ হন্যতে
৩৫। নরঃ গচ্ছতি	৩৬। নরেণ গম্যতে
৩৭। লোকটা বাঘটাকে মারে	৩৮। লোকটার হাতে বাঘটা মারা পড়ে
৩৯। লোকটা যায়	৪০। লোকটার যাওয়া হয়

২৬, ২৮, ৩৫, ৩৬-এর কাজ-চালানো তরজমা যথাক্রমে ৩৭-৪০। ২৬ আর ৩৫-এর বাচ্য কর্তৃবাচ্য, ২৮-এর কর্মবাচ্য, ৩৬-এর ভাববাচ্য। এখানে

যে আলোচনা করছি তা সংস্কৃত নিয়ে, বাঙলা নিয়ে নয়। বাঙলার কথায় আসছি একটু বাদে। ৩৭-৪০ এখানে অনুবাদ মাত্র, স্বয়ং কোনো ব্যাপারের দৃষ্টান্ত নয়।

২৬ আর ৩৫-এ ক্রিয়ার অভিধেয় (সাবজেক্ট) বা বাচ্য বা নির্দেশ্য হলো কর্তা। কে মারে বা যায়? 'লোকটা' মারে বা যায়। অর্থাৎ 'মারে' বা 'যায়' ক্রিয়াপদে ক্রিয়ার কর্তা 'লোকটা'-র কথা বলে, লোকটাকে বা চি ত করে। তাই বলা হয় যে এখানে ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য।

আগেই বলেছি বাচ্য বদলালেও কারক একই থাকে। ২৬ আর ২৮ দুই বাক্যেই হনন-ক্রিয়ার, মারা-ক্রিয়ার, কর্তা হলো লোকটা আর কর্ম হলো বাঘটা। ২৬-এ কর্তৃবাচ্য তাই ক্রিয়াপদ 'হন্তি' লোকটাকে, ক্রিয়ার কর্তাকে বেছে নেয় অভিধেয় হিসেবে। ২৮-এ কর্মবাচ্য তাই 'হন্যতে' অর্থাৎ 'মারা পড়ে' অভিধেয় (সাবজেক্ট) হিসেবে ক্রিয়ার কর্মকে, বাঘটাকে বেছে নেয়। হন্তি আর হন্যতে-র মধ্যে, মারে আর মারা-পড়ে-র মধ্যে, তফাতটা এই।

ভাববাচ্যের কথা ওঠে যখন কর্ম থাকে না। ৩৫ আর ৩৬-এ যাওয়া ক্রিয়ার খালি কর্তাই আছে, লোকটা ; কোনো কর্ম নেই ; যাওয়া ক্রিয়াটা সকর্মক নয়, অকর্মক। ক্রিয়াটা যদি কর্তার কথা বলে তাহলে পাই কর্তৃ-বাচ্যের রূপ ৩৫, যার মানে ৩৯। যদি কর্তার কথা না বলে তাহলে ক্রিয়াটা নিজেরই কথা বলে, এর নাম ভাববাচ্য, যেমন ৩৬, যার মানে ৪০।

আশা করি লক্ষ করেছেন যে এসব তথ্যের সঙ্গে ৩৪-এর সংগতি নেই। কর্তার প্রপাত ২৬ আর ৩৫-এ প্রথম প্রপাত ঠিকই, কিন্তু, ২৮ আর ৩৬-এ তৃতীয় প্রপাত। কর্মের প্রপাত ২৬-এ দ্বিতীয় বটে, কিন্তু ২৮-এ প্রথম প্রপাত।

বলতে পারেন, রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন 'সাধারণত' ৩৪ খাটে। তার মানে কর্তৃবাচ্যই সাধারণ, কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্য অসাধারণ? প্রথমত, সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষত কৃদন্ত কর্মবাচ্য প্রয়োগের ছড়াছড়ি! কর্তৃবাচ্যের স্পষ্ট কোনো আধিপত্য নেই। 'সাধারণত' কথাটা কোনো রাশিবৈজ্ঞানিক অর্থেও এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

দ্বিতীয়ত, কর্তৃবাচ্যেও ৩৪ ভুল, সম্প্রদানকারকের বেলায় ; ৩০, ৩২ স্মর্তব্য। তৃতীয়ত, ব্যাকরণে রাশিবৈজ্ঞানিক বিচারকে প্রাধান্য দেওয়াটা

পদ্ধতির ভুল, বেশ বড় ভুল ; ব্যাকরণ রাশিগত বিজ্ঞান নয়, গুণগত বিজ্ঞান। কাজেই ওই অজুহাত অচল।

বুঝে নেওয়া দরকার কারকের সঙ্গে প্রপাতের আসল যোগটা কী ধরনের।

সবচেয়ে জরুরি খবর এই যে প্রথম প্রপাতের ('নরঃ, ব্যাঘ্রঃ) বিভক্তির সঙ্গে কোনো কারকের সরাসরি প্রতিষঙ্গ নেই। পাণিনির ভাবনায় এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের গোটা ঐতিহ্যেই 'প্রথমা বিভক্তি' হলো অভিধেয়র বিভক্তি। 'অভিধেয়' কোনো কারকের নাম নয়। ক্রিয়া যে কারকের কথা বলবে ব'লে ঠিক করেছে সেই কারক ক্রিয়ার অভিধেয়—কর্তৃবাচ্যে কর্তা, কর্মবাচ্যে কর্ম, ভাববাচ্যে কেউ না। সংস্কৃতে একবচন দ্বিবচন আর বহুবচনের তফাত আছে, আর আছে প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ আর উত্তম পুরুষের তফাত। অভিধেয়র বচন আর পুরুষ তার ক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয় :

৪১। নরাঃ ব্যাঘ্রং ঘ্নন্তি ৪২। লোকগুলো বাঘটাকে মারে

৪৩। নরৈঃ ব্যাঘ্রঃ হন্যতে ৪৪। লোকগুলোর হাতে বাঘটা মারা পড়ে

৪১ মানে ৪২ ; ৪৩ মানে ৪৪। ৩১-এও যেমন 'লোকগুলো' কর্তা, ৪৩-এও তেমনি। কিন্তু ক্রিয়ায় দেখি ৩১-এ 'নরাঃ'-র বহুবচন প্রতিফলিত, ৪৪-এ 'ব্যাঘ্রঃ'-র একবচন। ক্রিয়া তো আর কর্তা হিসেবে কর্তার পুরুষ-বচন প্রতিফলিত করে না। ক্রিয়ার কাজ হলো তার অভিধেয়র পুরুষ-বচন প্রতিফলিত করা, সে অভিধেয় কর্তাই হোক (৪১) আর কর্মই হোক (৪৫)।

৪৫। নরেণ ব্যাঘ্রাঃ হন্যন্তে

৪৬। লোকটার হাতে বাঘগুলো মারা পড়ে

৪৫-এ কর্তার একবচন অগ্রাহ্য ক'রে ক্রিয়া বহুবচনের রূপ ধারণ করেছে, কারণ কর্মবাচ্য হওয়াতে ক্রিয়ার অভিধেয় এখানে কর্ম, এবং কর্মের বচন বহুবচন।

ভাববাচ্যে অভিধেয় নেই, তাই ক্রিয়া কারুর কোনো পুরুষ-বচন প্রতিফলন করে না—

৪৭। ময়া গম্যতে ৪৮। আমার যাওয়া হয়

৪৯। ত্বয়া গম্যতে ৫০। তোমার যাওয়া হয়

৫১। অস্মদ্ভিঃ গম্যতে

(ইচ্ছে ক'রেই বিসর্গ-সন্ধি করছি না কোথাও, যাতে সংস্কৃত না জানা পাঠকের অসুবিধে না হয়)

৫২। আমাদের যাওয়া হয়

কর্তা যেই হোক, ক্রিয়া অবিচল থাকবে তার নিরপেক্ষ প্রথম পুরুষ এক-বচনের চেহারায়।

মোট কথা, ক্রিয়া, কর্তৃবাচ্যে কর্তাকে আর কর্মবাচ্যে কর্মকে প্রতিফলনের জন্য বেছে নেয়, অভিধেয় হিসেবে, এবং ভাববাচ্যে কাউকে অভিধেয় করে না, কারুর পুরুষাদি প্রতিফলন করে না।

যে কারককে অভিধেয় হিসেবে ক্রিয়া বেছে নিয়েছে তার সর্বদাই প্রথম প্রপাত। যেসব কারককে অভিধেয় হিসেবে বেছে নেওয়া হলো না, যারা সংস্কৃত ঐতিহ্যের পরিভাষায় 'অনভিহিত' কারক, তাদের প্রপাত নিয়ে বিশেষ নিয়মাবলী আছে। সেসব নিয়মের ছক ৩৪ নয়, ৫৩ :

৫৩। অনভিহিত কারকের ছক

কারক	'বিভক্তি' (প্রপাত)
কর্তা	তৃতীয়া
কর্ম	দ্বিতীয়া
করণ	তৃতীয়া
সম্প্রদান	স্বত্বত্যাগে চতুর্থী, নইলে ষষ্ঠী
অপাদান	পঞ্চমী
অধিকরণ	সপ্তমী

এইসব নিয়মের জোরেই ২৬-এ ব্যাঘ্রং-এর দ্বিতীয় প্রপাত, ২৮ আর ৩৬-এ নরেণ-র তৃতীয়, ৩০-এ রজকস্য-র ষষ্ঠ, ৩২-এ দরিদ্রায়-র চতুর্থ ইত্যাদি।

৫৩-য় প্রথমা বিভক্তির উল্লেখ নেই, কারণ প্রথম প্রপাত হলো অভিধেয়র প্রপাত। অনভিহিতদের নিয়েই ৫৩-র কারবার!

বারো

এবার বুঝতে পারছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভুল। উনি বলেছিলেন— উদ্ধৃতিটা আবার দিই—সংস্কৃত ব্যাকরণে 'উপসর্গপূর্বক ক্রুধ্-ধাতু ও দ্রুহ্-ধাতুর সম্প্রদান কর্ম হইয়া যায়। ক্রীড়ার্থক দিব্-ধাতুর করণকারকে বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা পায়। কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে। যদি বিভক্তি-চিহ্নের খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কর্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে দানক্রিয়ার সম্প্রদানকে কর্মসংজ্ঞা

দিলে এমন কী অপরাধ হইবে ?' এই অপরাধ হইবে যে আপনার 'কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তি' এই উক্তির ভ্রম সংশোধিত হইবে না, সুনীতিবাবুর ন্যায় পণ্ডিত ভাষাবিজ্ঞানীও তাহাকে প্রশ্রয় দিবেন, যেহেতু আপনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং যেহেতু স্বয়ং রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদও একই গর্তে পা দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত বৈয়াকরণরা ভেবেচিন্তেই বলেছিলেন যে 'ক্রীড়ার্থক দিব্‌-ধাতুর করণকারকে বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা পায়', কথাটা 'কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে' বলেননি। সেকালে বেলুন ছিল না, কিন্তু ধরুন সংস্কৃতে 'বেলুনঃ' ব'লে একটা কথা তৈরি হলো ; তাহলে বলা যায় :

৫৪। শিশুঃ বেলুনেন দীব্যতি ৫৫। শিশুঃ বেলুনং দীব্যতি

অর্থাৎ বাচ্চাটা বেলুন নিয়ে খেলছে (৫৪) অথবা বেলুন খেলছে (৫৫)। ৫৪-য় করণকারকে তৃতীয় প্রপাত, বেলুনেন। ৫৫-য় কর্মকারকে দ্বিতীয় প্রপাত বেলুনং। সংস্কৃত ঐতিহ্যের পরিভাষায় হয়ত আমরা বলতে চাইবো যে খেলার সময় খেলনাকে করণ বা 'সাধকতম'ও ভাবা যায়, কর্ম বা 'ঈপ্সিততম'ও ভাবা যায়। অথবা হয়ত ভাবতে চাইবো যে খেলনা সবসময়ই 'সাধকতম', এমনিতে তার উপকরণ হিসেবে অর্থাৎ করণকারকেই তৃতীয় প্রপাতের চিহ্ন গায়ে দিয়ে আসরে নামবার কথা, কিন্তু বিকল্পে তার কর্মকারকও হয়, তখন কর্তৃবাচ্যে তার দ্বিতীয় প্রপাত, যেমন ৫৫। এইজন্যে রামেন্দ্রসুন্দর ভেবেছেন যে 'কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে' গোঁজামিল দিয়ে বলা হলো যে কর্মকারকও হয়। উনি লক্ষ করেননি যে কর্ম বলায় সঙ্গে সঙ্গে ৫৫-র পাশাপাশি ৫৬ও হয়, যার অনুবাদ ৫৭।

৫৬। শিশুনা বেলুনঃ দীব্যতে

৫৭। The balloon is being played with by the child

এখানে কর্মবাচ্য, তাই ক্রিয়ার কর্ম 'বেলুনঃ' প্রথম-প্রপাতী অভিধেয়, এবং অনভিহিত কর্তা ব'লে 'শিশুনা'-র তৃতীয় প্রপাত। ক্রীড়ার্থক দিব্‌-ধাতু করণের জায়গায় বিকল্পে কর্মও নেয় একথা বলার একমাত্র কারণ ৫৫-য় 'বেলুনং'-এর 'দ্বিতীয়া বিভক্তি' নয়। ৫৫-র 'বেলুনং' আর ৫৬-র 'বেলুনঃ' মিলিয়েই বুঝে নিতে হয় যে বেলুন কর্ম হিসেবে কাজ করছে। রামেন্দ্রসুন্দর বিষয়টা নিয়ে তলিয়ে ভাবেননি।

প্রথমত, রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তি ছিল এই যে সংস্কৃত ঐতিহ্যেও চতুর্থ

প্রপাত দেখে সম্প্রদানকারক আর দ্বিতীয় প্রপাত দেখে কর্মকারক বলার রেওয়াজ ছিল, অতএব বাঙলায় 'কে'-বিভক্তি দেখে আমাদের ৩১-এর 'ধোপাকে' আর ৩৩-এর 'গরিবকে'-র মতো পদকে বলা উচিত এক রকম কর্ম, গৌণ কর্ম। আমরা দেখেছি যে এ যুক্তির ভিত্তিটাই নড়বড়ে, কারণ নিছক দ্বিতীয় প্রপাত আর চতুর্থ প্রপাতের বিভক্তি দেখেই কর্ম আর সম্প্রদান বলা হতো না সংস্কৃত ঐতিহ্যে।

দ্বিতীয়ত, যদি রামেন্দ্রসুন্দর এবং তাঁর মতো নব্য চিন্তার মানুষজন বাঙলায় নিছক বিভক্তি দেখেই কারক ঠিক করতে চেয়ে থাকেন—সংস্কৃতে কী ছিল সেকথা ছেড়ে দিয়ে—তাহলে তাঁদের কোনো অধিকার নেই এ কথা বলার যে সাহেব ১৮-১৯-এ 'মুখ্য কর্ম' আর ২০-তে 'গৌণ কর্ম', যে কথা ওঁদের প্রেরণায় সমস্ত ইস্কুলপাঠ্য বাঙলা ব্যাকরণের বইয়ে বলা আছে :

১৮। ওরা সাহেবকে দেখেনি

১৯। ওরা সাহেব দেখেনি

২০। ওরা সাহেবকে ঘুষ দেয়

যদি 'কে'-বিভক্তি থাকা না থাকা দিয়ে কারক ঠিক করতে হয় তাহলে 'সাহেব'-এর ১৮ আর ২০-তে একই কারক এবং ১৯ আর ২১-এ একই কারক :

১৯। ওরা সাহেব দেখেনি

২১। সাহেব আসেননি

কারণ, ১৮ আর ২০-তে 'কে' আছে 'সাহেব'-এর গায়ে, ১৯ আর ২১-এ কোনো দৃষ্টিগোচর বিভক্তি নেই। এ রকম কথা কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বলেননি। নিছক বিভক্তি দেখে কারক ঠিক করার নীতিটাও রামমোহন থেকে রামেন্দ্রসুন্দর পর্যন্ত এইসব মনীষী পুরোদস্তুর অনুসরণ ক'রে দেখেননি কী হয়। 'কারক' কথাটার খোলনলচে পালটে দেওয়ার মতো সাহস ছিল না ওঁদের।

বলছি না যে সেটাই করা দরকার। বলছি যে প্রথমত ওঁরা বোঝেন নি সংস্কৃত ঐতিহ্যে কারক মানে কী ; দ্বিতীয়ত, ওঁরা কারক বলতে যা বুঝে-ছিলেন, অর্থাৎ নিছক বিভক্তির চেহারা দেখে নির্ণয় করা যায় এমন একটা জিনিস, সেই ধারণাটাও পরিস্ফুট ক'রে মেলে ধরেননি কোনো নতুন আত্ম-সংগত (স্ববিরোধমুক্ত) চিন্তাতন্ত্রে।

অর্থাৎ নবজাগৃতির এইসব মনীষী অতীতের ঐতিহ্যটাও বোঝেননি, নিজেরা যা সব বলছেন তা মানলে ছবিটা কী দাঁড়ায় তাও বোঝেননি। ওঁরা না বুঝতেন অতীতকে, না বুঝতেন বর্তমানকে।

'অপরে পাওনা আদায় করছে আগে, / আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার' ('উটপাখী', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)।

তেরো

২৬, ২৮, ৩৫, ৩৬ নিয়ে কথা বলতে সুবিধে হবে ব'লে ৩৭-৪০ জুড়ে দিয়েছিলাম। ওগুলোর দিকে এবার নজর দিই।

৩৭। লোকটা বাঘটাকে মারে ৩৮। লোকটার হাতে বাঘটা মারা পড়ে

৩৯। লোকটা যায় ৪০। লোকটার যাওয়া হয়

এগুলোর বেলায় সংস্কৃত ঐতিহ্যের ধারণাগুলো কতটা প্রযোজ্য? ৩৮-এর 'মারা পড়ে' কি সেই অর্থে কর্তৃবাচ্য 'মারে'-র কর্মবাচ্য-প্রতিরূপ যে অর্থে সংস্কৃতে হন্ ধাতুর কর্তৃবাচ্যরূপ হন্তি আর কর্মবাচ্যরূপ হন্যতে? আমরা কি বলতে পারি যে মার্ ধাতুর দুই বাচ্যে দুই রূপ, মারে আর মারা পড়ে?

তা যদি বলতে চাই তাহলে বক্তব্যটা এই দাঁড়াবে যে কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার বিভক্তি -এ (মার্-এ) আর কর্মবাচ্যে বিভক্তি -আপড়ে (মার্-আপড়ে)। 'পড়ে' ক্রিয়াপদের পদ হিসেবে স্বাতন্ত্র্য এখানে যতই ক'মে গিয়ে থাকুক, একেবারে হাওয়া হয়ে যায়নি : তাকে বিভক্তির অংশমাত্র ভাবা হবে, এটা বরদাস্ত করা কঠিন। 'মারা পড়ে' ক্রিয়াপদের ধাতু 'মার্' নয়, 'মারা পড়্'। সুনীতিবাবুর (সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ ১৩১) পরিভাষার বলতে পারি এই ধাতু 'সংযোগ-মূলক'। অতএব তার কর্তা 'বাঘটা'। অতএব ৩৮-এর বাচ্য কর্তৃবাচ্য।

বাঙলায় কর্মবাচ্য থাকতে পারে, কিন্তু এটা তার নমুনা নয়।

৪০ একটু ন্যাড়া-ন্যাড়া শুনতে, তবে অতীত কাল টাল ক'রে নিলে ('লোকটার যাওয়া হলো') সে মুশকিলটা চ'লে যায়। হ্যাঁ, এটাকে ভাববাচ্য বলতে লোভ হয়। এ লোভ না হয় না-ই সামলালাম। অনেকেই ৪০-কে ভাববাচ্য ভাবেন। এবং ৫৮-ও তাহলে ভাববাচ্যের উদাহরণ।

৫৮। লোকটার অন্তুকে দেখা হলো না

'অন্তকে' যদি কর্ম হয় তাহলে ৫৮-য় দেখছি যে বাঙলায় সকর্মক ক্রিয়ারও ভাববাচ্য হয়, সেটা সংস্কৃতে অসম্ভব। ৫৮ দেখে অনেকেরই বলতে ইচ্ছে করেছে যে এ ব্যাপারে বাঙলা সত্যিই সংস্কৃত থেকে আলাদা, এবং এই জন্যেই বাঙলায় কর্মবাচ্য নেই। যেমন, মিমি ক্লেম্যান একথা বলেছেন। আমরাও কি সায় দেবো? নাকি আমরা ব্যাপারটা নিয়ে নতুন ক'রে ভাববো?

আমার তো মনে হয় নতুন ক'রে ভাবা উচিত। স্নীতিবাবু (সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ পৃ ৩১৭) মনে করেন যে ৫৯ কর্মবাচ্যের এবং প্রায়-সমোচ্চারিত ৬০ ভাববাচ্যের দৃষ্টান্ত—

৫৯। আমার—ভাত—খাওয়া হয়েছে

৬০। আমার—ভাত খাওয়া হয়েছে

এমনিতে এসব বাক্যে 'ক্রিয়ার কর্মবাচ্য কি ভাববাচ্য, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর হইয়া পড়ে' (৩১৭)। কারণ, ক্রিয়া কর্মের প্রথম পুরুষ আর সামান্য গৌরব প্রতিফলন করছে, না এমনি ভাববাচ্যের ধ্রুব প্রথম পুরুষ আর সামান্য গৌরব বহন করছে, তা বোঝা যায় না। নাড়ীজ্ঞান ছিল স্নীতিবাবুর। উনি একথাটা যখন এভাবে তুলেছেন, তখন প্রশ্নটা নিয়ে একটু ভাবা উচিত।

যাঁরা মিমি ক্লেম্যানের মতো মনে করেন যে বাঙলায় সকর্মক ক্রিয়ার ভাববাচ্য হয়—যা সংস্কৃতে হয় না—তাঁরা বলতে বাধ্য যে সাধারণভাবে মানুষের ভাষায় তাহলে সকর্মক ভাববাচ্য হতে পারে। তখন প্রশ্ন ওঠে, সংস্কৃতে কেন এটা হয় না? হয়ত তার সদুত্তর পাওয়া যাবে, অথবা দেখা যাবে প্রশ্নটার গুরুত্ব নেই। কিন্তু অন্য ধরনের জরুরি প্রশ্ন ওঠে। যে হিন্দী ভাষায় বাঙলার মতোই কর্ম শূন্যবিভক্তি নিতে পারে (যেমন : তুম কমরে মেঁ বিল্লী রখোগে 'তুমি ঘরে বেড়াল রাখবে', যেখানে 'বিল্লী'-র বিভক্তি নেই), সেই হিন্দীতে 'জায়া জা সকতা হৈ' (যাওয়া যায়)-এর পাশাপাশি সকর্মক ভাববাচ্যে আমরা কেন বলতে পারি না : 'কমরে মেঁ বিল্লী রখ দিয়া গয়া', 'ঘরে বেড়াল রাখা হলো'? কেন বলা যায় কেবলমাত্র 'বিল্লী কো রখ দিয়া গয়া', যেখানে ক্রিয়া আদৌ প্রতিফলনশীল নয়, এবং 'বিল্লী রখ দী গয়ী', যেখানে বেড়াল অভিধেয় এবং তারই লিঙ্গ আর বচন ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপে প্রতিফলিত? এ প্রশ্নের সদুত্তর মিমি ক্লেম্যান বা তাঁর সহপথিকরা কেউ দিতে পারবেন এমন আশা কম। তাই বিকল্প খোঁজা।

প্রথমে এই লেখার সাত অংশটা আরেকবার প'ড়ে নিন ; অবধেয় আর প্রতিধেয় নিয়ে আমার প্রস্তাবটা ঝালিয়ে নিন একটু। তারপর চোদ্দ পড়বেন।

চোদ্দ

সংস্কৃত ঐতিহ্যের কর্মবাচ্যের ধারণাটা পালটে নিয়ে অবধেয়বাচ্য ব'লে একটা ধারণা তৈরি করা যাক। অবধেয়বাচ্যে ক্রিয়া তার অবধেয়কেই যুগপৎ অবধেয় এবং অভিধেয় হিসেবে ডবল খাতির করে, এবং এটা করছে তা বোঝাবার জন্যে নিজের অঙ্গে অবধেয়বাচ্যের বিশেষ বিভক্তি ধারণ করে, যে চিহ্ন নানা ভাষায় নানারকম। সংস্কৃতে তা কর্মবাচ্যের বিভক্তি ; সংস্কৃত ব্যাকরণে কর্মবাচ্যই অবধেয়বাচ্য। বাঙলায় তা ৫৯-এর 'ওয়া হয়েছে' ইত্যাদি অর্থাৎ যাকে আমরা ভাববাচ্যের বিভক্তি ভাবছি সেইসব বিভক্তি।

পাণিনীয় অর্থে যা 'কর্ম' তা সংস্কৃতে সবসময় কর্তৃবাচ্যে অবধেয় (এবং কর্মবাচ্যে অভিধেয়)। বাঙলায় তা নয়। বাঙলায়, আমরা সাত-এ দেখেছি, ১৮-র 'সাহেবকে' প্রতিধেয় আর ১৯-এর 'সাহেব' অবধেয়, যদিও দুটোই পাণিনীয় অর্থে 'কর্ম'। বাঙলায় অবধেয়র বিভক্তি 'কে' নয়, শূন্য। 'কে' হলো প্রতিধেয়র চিহ্ন।

অর্থাৎ অভিধেয়বাচ্যের ১৯-কে যদি বাচ্য পালটে অবধেয়বাচ্যে নিয়ে আসি তাহলে পাই ৬১।

১৯। ওরা — সাহেব — দেখেনি

৬১। ওদের — সাহেব — দেখা হয়নি

৬১-তে 'সাহেব' ক্রিয়ার অভিধেয়ও বটে, অবধেয়ও বটে। ১৯-এর অভিধেয় 'ওরা'-র প্রতিরূপ ৬১-তে 'ওদের' ; 'ওদের' ৬১-তে ক্রিয়ার উদ্দেয়। — ২৫ স্মর্তব্য।

এবার দেখা যাক ভাববাচ্যকেও এই থলেয় পুরতে পারি কিনা।

৬২। ওরা যাবে না

৬৩। ওদের যাওয়া হবে না

যদি ভাবি ৬৩-তে ক্রিয়ার অদৃশ্য অবধেয় রয়েছে :

৬৪। ওরা ০ যাবে না

তাহলে অবধেয়বাচ্যের সাধারণ নিয়মেই পেয়ে যাবো ৬৫ :

৬৫। ওদের ০ যাওয়া হবে না

এই ৬৫-র অদৃশ্য একাধারে-অভিধেয়-এবং -অবধেয় শূন্যটাকে ভুলে থাকলে ৬৫ আর ৬৩ একই জিনিস। অর্থাৎ ভাববাচ্যও এক ধরনের অবধেয়বাচ্য। ভাববাচ্যের এইজাতীয় বিশ্লেষণের প্রস্তাব পল পোস্টাল আর ডেভিড পার্লমাটারের।

সুনীতিবাবুর ৬০-এর অনুরূপ ৬৬-র একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

৬৬। ওদের সাহেব দেখা হয়নি

ভাবলেই হয় যে সাহেব দেখাটাকে ইচ্ছে করলে একটা সংযোগমূলক ক্রিয়া হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। এ ক্রিয়া 'অকর্মক', অর্থাৎ এর অবধেয় শূন্য অর্থাৎ ৬৬ আসলে ৬৩র (অর্থাৎ ৬৫র) মতো।

আর ৬৭ ?

৬৭। ওদের সাহেবকে দেখা হয়নি

এখানে 'সাহেবকে' অবধেয় নয়, প্রতিধেয়, কারণ 'কে' আছে ওর গায়ে। অর্থাৎ ৬৮ :

৬৮। ওদের সাহেবকে ০ দেখা হয়নি

আবার সেই শূন্য অভিধেয়-অবধেয়। পুরনো পরিভাষায় একেও বলতে হবে ভাববাচ্য। ক্রিয়াটা অকর্মক হ'লে কী হবে, অবধেয় তো শূন্য !

ছবিটার কয়েক আঁচড় এঁকেছি। অনেক কিছু করা বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই বোধহয় বোঝা যাচ্ছে যে বাঙলা বাচ্যের আলোচনায় স্পষ্টতা আনতে চাইলে ধেয়তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। বিশেষত ৬৩-৬৮-র উদ্ধেয় 'ওদের'-এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা জরুরি। এ লেখায় ও কাজে হাত দেওয়া হবে না। কিন্তু সমস্যাটা উল্লেখ ক'রে রাখছি। এ নিয়ে অল্পবিস্তর গবেষণা হয়েওছে। আরো বেশি হওয়া দরকার।

পনেরো

এ ছবিতে কারকের কোনো স্থান আছে কি ?

পাণিনীয় ঐতিহ্যে কর্তা কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই জিনিসগুলোকে বাঙলার বেলায় কাজে লাগানো শক্ত। আমরা দেখেছি যে কর্ম আর সম্প্রদানের সঙ্গে বাঙলা অভিধেয়বাচ্যের অবধেয় আর প্রতিধেয় পুরোপুরি মেলে না ; যেমন, ১৮-র আর ২২-এর 'সাহেবকে' প্রতিধেয় কিন্তু কর্ম। 'আমার কাউকে লাগবে না'-র মতো

বাক্যে 'আমার' পদের কারক কী এ প্রশ্নেরও কোনো সংস্কৃতভিত্তিক সদুত্তর দেওয়া কঠিন।

বরঞ্চ পাণিনির কারকার্থ, যেমন কর্তাকারকের অর্থ 'স্বতন্ত্র', কর্মের অর্থ 'ঈপ্সিততম', করণের অর্থ 'সাধকতম', সম্প্রদানের অর্থ 'কর্মের মাধ্যমে কর্তা যাকে ইণ্ডিকেট করছে'—এগুলো যে ধরনের জিনিস, যাকে আজকালকার পশ্চিমী পরিভাষায় 'থেটারোল' বা থেটাভূমিকা বলে, তার দরকার সত্যিই আছে বাঙলা ধেয়তত্ত্বের জুড়ি হিসেবে। এটা টের পেয়েছি সম্প্রতি বাঙলা অনুধেয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে (সে গবেষণার প্রতিবেদন অন্যত্র ছাপা হচ্ছে)।

এদিকে থেটা-ভূমিকা লাগবে। ওদিকে বিভক্তির এককেটা টাইপ অর্থাৎ প্রপাতও লাগবে। ধেয় জিনিসটা এ দুয়ের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করবে। এই লেখায় ভাব দেখিয়েছি যেন প্রপাত আর ধেয় একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মাত্র, ধেয় আর প্রপাতের মধ্যে যেন ফারাক থাকতে পারে না কখনোই। আসলে এ রকম কোনো কথা নেই। প্রপাত ঘেঁষে ধেয়তত্ত্ব সাজাতে পারলেই সুবিধে ঠিকই, কিন্তু খেয়াল করুন যে বিভক্তি ধরলে অভিধেয় আর অবধেয়র প্রপাত বাঙলায় একই ; ২৫এর মতে বাঙলায় অভিধেয় আর অবধেয়র তফাত খালি প্রতিফলনের—এটা ঠিক প্রপাতের ব্যাপার নয়।

এদিকে থেটা-ভূমিকা, ওদিকে প্রপাত, মাঝখানে ধেয়। কারকের সত্যিই কোনো স্থান নেই এ ছবিতে! সংস্কৃত ঐতিহ্যের কারকতন্ত্র বাঙলার বিশ্লেষণে সুবিধাজনক নয়, এটা ঠিকই ধরেছিলেন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, সুনীতিকুমার, রামেন্দ্রসুন্দর। কিন্তু তার বদলে কী তৈরি করতে হবে, এ প্রশ্নটা তাঁরা এড়িয়ে গিয়ে তখনকার মতো জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাতে চেয়েছিলেন নানা কারণে। আজকের যুগের ভাষাবৈজ্ঞানিক মহলে ধেয়তত্ত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের আর আলোচনার ঝড় বইছে। আজ বাঙলা ধেয়তত্ত্বের বিশেষ গতিপ্রকৃতি নিয়ে বাঙালী ভাষা-বিজ্ঞানের কর্মীরা তো প্রশ্ন তুলবেই। এবং এর ফলে আমাদের সংস্কৃতি থেকে কারকতত্ত্ব তো আস্তে আস্তে স্থানচ্যুত হবেই। নানা ঐতিহাসিক কারণে এ প্রক্রিয়া আজ শুরু হচ্ছে, এক শতক আগে শুরু হয়নি, এ নিয়ে হয়ত বেশি খেদ করা উচিত নয়। বরং কাজের গতিকে তীব্রতর, কর্মী সম্প্রদায়ের সহকর্মের সংহতিকে ঘনীয়ান ক'রে তোলা উচিত, যাতে আরো বেশি দেরি না হয়।

বাঙলা অব্যয় 'যে'

এক

ইস্কুলের শিক্ষকদের কর্তৃত্বপরায়ণ শিক্ষারীতির দোষে এবং ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের ফেলা-ছড়ানো দুঃস্বপ্নের অভিঘাতে অনেকেই বাঙলা ব্যাকরণকে ভয় পেতে শিখেছে এবং শিখছে। ভাষা নিয়ে যাঁরা প্রশ্নই করেন, চটপট আধতৈরি জবাব খামে ভ'রে নিয়ে তৃপ্ত হওয়ার ঝোঁক যাঁদের নেই, এমন কিছু কিছু মানুষ সম্প্রতি বাঙলা ভাষার অর্ধপরিচিত সমস্যার জগতে ঘুরে দেখতে শিখছেন।

'বাঙলা নিপাত "তো"' (**ভাষা ২ : ১. ৬৮-৭৪, ১৯৮৩**) প্রবন্ধের লেখক অরুণ ঘোষ এঁদের একজন। কিন্তু আধুনিক বা প্রাচীন ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষার জগতে তাঁর মতো স্বচ্ছন্দ বিচরণ আমাদের অনেকেরই নেই। তাই তাঁর ব্যবহৃত 'নিপাত' ধারণায় প্রাচীন ভারতীয় আর আধুনিক পশ্চিমী অনুষঙ্গ এসে মিশেছে এটা লক্ষ করেও মনে হ'লো ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে 'অব্যয়' ব'লে যে জায়গাটা অনেকেরই চেনা সেখানে দাঁড়িয়ে কথা শুরু করাই ভালো। কথা বলতে চাই ওই 'তো'-রই জাতভাই 'যে'-র বিষয়ে।

অব্যয়জাতি একটা ডাস্টবিন। যে জিনিসকে হলফ ক'রে বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম বা ক্রিয়া বলা গেল না অথচ আস্ত পদ ব'লে স্বীকৃতি দিতে হলো (যে স্বীকৃতি 'লোকটা' পদের 'টা' পদাংশ পাবে না) সেই জিনিসই, বাঙলা ব্যাকরণে, অব্যয়। অন্তত আমার প্রজন্মকে ইস্কুলে এই শেখানো হয়েছিল। ছি ছি, জন্যে, না, ইতি, তবে, এবং—সবই অব্যয়।

বাঙলায় একাধিক 'যে' আছে। প্রত্যেকটা সূক্ষ্ম তফাত নিয়ে চিন্তিত হবো না। তবে এটুকু খেয়াল করা দরকার যে, কোনো কোনো প্রয়োগে 'যে' একটা অব্যয় (১-২), কোনো কোনো প্রয়োগে অন্য জিনিস (৩-৬)—সর্বনাম বিশেষণ-টণ যাই বলুন।

১। আমি একথা জানতাম যে ও আসবে না

২। ও-যে আসবে না একথা আমি জানতাম

৩। যে যা চায় সে তা পায় না
৪। যে দিক দিয়ে গেলে স্থবিধে
৫। নিখিলেশ যেরকম ভাবে বেঁচে আছে
৬। যে যে দেশ এ পথ বেছে নিয়েছে

এই লেখায় কথা বলব ১ আর ২-এর মতো বাক্যের অ ব্য য় 'যে' নিয়ে। সর্বনাম বা বিশেষণ 'যে' নিয়ে এবার কথা হবে না। ৩-৬ উল্লেখ করলাম যাতে স্পষ্ট হয় যে ওই ধরনের 'যে' আলোচনা করার দায়িত্ব নিচ্ছি না।

১-এর 'যে' আর ২-এর 'যে' দুটোই অব্যয়। কিন্তু ঠিক এক জাতের অব্যয় নয়। তফাত আছে বেশ কয়েকটা। সেগুলো নিয়ে যাতে কথা বলা যায় সেজন্যে দুটো নাম পেলে ভালো হয়। ২-এর 'যে'-কে অন্যত্র 'নোঙর' বলেছি। ১-এর 'যে'-টাকে বলা যাক 'যোজক'। নামকরণের কারণ পরে বলব। আপাতত নামকরণ শুধু উল্লেখের স্থবিধের কথা ভেবেই।

দুই

'যে' ছাড়া আরো নোঙর আছে। যেমন 'তো', 'বুঝি', 'কি'। নোঙর ফেলা চলে বাক্যের যে কোনো অংশের ঠিক পরেই :

৭। রাম-কি ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে ?
৮। রাম ব্যাগটা খুঁজতে-কি এ ঘরে আসবে ?
৯। রাম ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে-কি আসবে ?
১০। রাম ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে-কি ?

'যে' নোঙরটাও এভাবেই কাজ করে—'রাম-যে ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে', 'রাম ব্যাগটা খুঁজতে-যে এ ঘরে আসবে', ইত্যাদি।

'তো' আর 'বুঝি'-র কাজের ধরনও তাই—'রাম-তো ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে', 'রাম ব্যাগটা খুঁজতে-তো এ ঘরে আসবে', ইত্যাদি। 'রাম-বুঝি ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে ?', ইত্যাদি।

এসব বাক্যের সঙ্গে ১১-১৩-র তুলনা চলে না।

১১। কী, রাম ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে ?

১২। তো রাম ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে

১৩। বুঝি রাম ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে

বাক্য হিসেবে ১২ আর ১৩ একটু গোলমেলে। তবে সেকথা থাক। এটুকুই বলছি যে, ৭-১০-এর দলে ১১ শামিল নয়। ১২ তুলনীয় নয় 'রাম-তো ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে'-র সঙ্গে। আর 'রাম-বুঝি ব্যাগটা খুঁজতে এ ঘরে আসবে ?'-র অনুরূপ নয় ১৩।

এক কথায়, কোনো বাক্যের নোঙর সেই বাক্যের একেবারে প্রথম উপাদান হিসেবে দাঁড়ায় না। দাঁড়াচ্ছে মনে হ'লে সেই মনে-হওয়াটা একটা ইলিউশন, মহাশ্রদ্ধেয় কমিটির তৈরি-করা পরিভাষায় যাকে বলে 'অধ্যাস'। (চলন্তিকার ৫ পরিশিষ্ট দেখুন।) ১১-১৩ দেখে মনে হ'তে পারে যে, বাক্যের আরম্ভে বাক্যের নোঙর বসতে পারে। কিন্তু ১১-র ওই 'কী' নোঙর-'কি' নয়। ১২ বা ১৩ আদৌ যাঁদের কানে গোলমেলে ব'লে ঠেকে না তাঁরাও মানবেন যে ওই 'তো'-টা নোঙর 'তো' নয়, এই 'বুঝি'-ও নয় নোঙর 'বুঝি'।

নোঙরের অন্যতম ধর্ম এই যে তার বাঁ পাশে প্রকাশ্য বা উহ্য একটা হাইফেন থাকে। বাক্যের শুরুতে বসলে এটা করা চলে না। নোঙর তাই বসে না বাক্যের গোড়ায়।

তিন

এই সাধারণ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে দাঁড়াবার মতো বিরুদ্ধ উদাহরণ আছে ? কেউ 'যে'-র কথা বলবেন, কেউ-বা তুলবেন 'বা'-র কথা। এই 'কেউ-বা' কী জিনিস ?

১৪। কেউ-বা একা, কারো-বা সঙ্গী ক্লান্ত

১৪-র বদলে 'বা কেউ একা, বা কারো সঙ্গী ক্লান্ত' বলা চলত ? না, বাঙলাই হ'লো না ওটা, অন্তত একা-দাঁড়ানো বাক্য হিসেবে। বাক্য 'বা' দিয়ে শুরু হ'তে পারে না তা নয়, যদিও 'বা'-র বদলে 'কিংবা' বা 'অথবা' বললে বাক্যের প্রসাদগুণ বাড়ে—

১৫। বা (কিংবা, অথবা) আমরাই না-হয় যাবো

কিন্তু বাক্যশুরুর 'বা' নোঙরের কাজ করে না ; বলতে পারি না ১৬-১৮।

১৬। আমরাই-বা না-হয় যাবো
১৭। আমরাই না-হয়-বা যাবো
১৮। আমরাই না-হয় যাবো-বা

মনে হচ্ছে দুটো 'বা' আছে। ১৪-রটা নোঙর। ১৫-রটা যোজক। একটা অন্যটার কাজ করতে পারে না।

বাক্য নোঙর দিয়ে শুরু হয় না এ সিদ্ধান্ত তা হ'লে আপাতত বজায় থাকছে।

চার

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে-কি ? এবার আরো জোরালো বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত মনোযোগ টানবে—

১। আমি একথা জানতাম যে ও আসবে না
১৯। যে ও আসবে না
২। ও-যে আসবে না একথা আমি জানতাম
২০। ও-যে আসবে না

আগেই-দেওয়া ১ আর ২ দৃষ্টান্তের অংশ ১৯ আর ২০ লক্ষণীয়। মনে হ'তেই পারে যে ১৯ আর ২০ সমার্থক। এ থেকে এগিয়ে গিয়ে আরো মনে হ'তে পারে যে ১৯-এর যোজক 'যে' ২০-র নোঙর 'যে'-র তুল্যমূল্য।

মূল্য হ'তেই পারে তুল্য। প্রশ্ন ওঠে জাতি নিয়ে। যোজক 'যে'-র মূল্য যতই নোঙর 'যে'-র মূল্যের কাছাকাছি আসুক না কেন, যোজক আর নোঙরের জাতিগত তফাতটা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। মূল্য অর্থাৎ মানেটা একই ধরনের হ'লেও আচরণ বা ব্যাকরণ আলাদা থাকবেই। এটাই এ লেখার বিষয়। কাজেই ১৯ আর ২০ যদি তুল্যমূল্য হয় তাতেও প্রমাণ হয়

না যে বাক্যের শুরুতে নোঙর বসতে পারে। ১৯-এর প্রথম উপাদানটাকে নোঙর না ভেবে যোজক ভাবা চলে। যোজক আর নোঙরের জাতিভেদ রেখে দুই 'যে'-র সমার্থক হ'তে কোনো বাধা নেই।

হয়তো ভাবছেন জোর করে একটা অস্বাভাবিক সিদ্ধান্তে অটল থাকছি। তত্ত্বের খাতিরে তথ্য উপেক্ষা করছি। তা কিন্তু নয়। নোঙর 'যে' আর যোজক 'যে' সত্যিই জাতে আলাদা।

পাঁচ

২১। রাম হুকুম করেছে যে শ্যামকে বার ক'রে দেওয়া হোক

এই বাক্যে যোজক 'যে' ব্যবহৃত হয়েছে। তুলনীয় কোনো বাক্যে নোঙর 'যে' ব্যবহার করা যেতো? না। 'শ্যামকে-যে বার ক'রে দেওয়া হোক রাম এমন হুকুম করেছে' এ রকম বলি না। আদৌ 'শ্যামকে-যে বার ক'রে দেওয়া হোক' এই অঙ্গবাক্যটাই হয় না। 'হোক'-এর সঙ্গে এক অঙ্গবাক্যে কাজ করে না নোঙর 'যে'। 'হোক' পদটা অনুজ্ঞা ভাবের (ইমপেরেটিভ মুডের) ক্রিয়াপদ। নোঙর 'যে'-র যা মানে তার সঙ্গে অনুজ্ঞা ভাব মিশতে পারে না। ২১ দেখে বুঝতে পারছি যে যোজক 'যে'-র মানেটা অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে নির্বিবাদে কাজ করতে পারে। এটুকু অন্তত তফাত আছে দুই 'যে'-র মধ্যে। এটাকে মানে-র তফাত বলতে না চাইলেও, আচরণের তফাত বলতেই হবে। দুই 'যে' দুরকম ব্যবহার করে। নোঙর 'যে' অনুজ্ঞা ভাব এড়িয়ে চলে। যোজক 'যে'-র অনুজ্ঞা ভাবে কিছু এসে যায় না।

তত্ত্বের দিক থেকে স্পষ্টতই আমার ভালো লাগতো যদি দাবি করতে পারতাম যে, সব নোঙরই অনুজ্ঞা ভাবকে এড়িয়ে চলে এবং কোনো যোজকই অনুজ্ঞা ভাবকে এড়িয়ে চলে না। কিন্তু এ দাবির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই এবং বিপক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যায়।

পক্ষে—দুটো নোঙর ('বুঝি' আর 'কি') কাজ করতে পারে না অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে; দুটো যোজক ('এবং' আর 'অথবা') পারে। এসব কথার সত্যতা পরীক্ষা ক'রে নিতে পারবেন সহজেই।

বিপক্ষে—একটা নোঙর ('তো') অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে কাজ করতে পারে; দৃষ্টান্ত—

২২। আগে-তো চাকরিটা হোক
২৩। আগে চাকরিটা-তো হোক
২৪। চাকরিটা-তো হোক আগে

আর, একটা যোজক আছে, 'কারণ' যার সঙ্গে অনুজ্ঞা ভাবের বনে না। বলতে পারি না 'শ্যাম খুব চিন্তিত, কারণ যদু চ'লে যাক'। (পরে দেখাবো যে 'কারণ' একটা যোজক।)

এই অবস্থা দেখে কোনো কোনো বিজ্ঞানী আপাতত ছেড়ে দেবেন ; বলবেন যে অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে বনবে কিনা এ ব্যাপারে নোঙরজাতিরও কোনো জাতিগত পরিহারনীতি নেই, যোজকজাতিরও নেই জাতিগত সহাবস্থাননীতি।

অন্য মেজাজের বিজ্ঞানী বলবেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তিনি হয়তো একটা তাৎক্ষণিক উপকল্প (অ্যাডহক হাইপথিসিস) খাড়া করবেন। যোজক দুরকম, আসল যোজক আর নকল যোজক। নোঙর দুরকম, আসল নোঙর আর নকল নোঙর। 'যে কি, বুঝি' আসল নোঙর। 'যে, এবং অথবা' আসল যোজক। নোঙর হিসেবে 'তো' আর যোজক হিসেবে 'কারণ' আসল নয়, নকল। অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে আসল নোঙরের বনে না, আসল যোজকের বনে। কিন্তু অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে নকল নোঙর কাজ করতে পারে, নকল যোজক তা পারে না।

এ ধরনের তাৎক্ষণিক উপকল্প অনুসন্ধানটাকে এগিয়ে দেওয়ার বদলে বরং দাঁড় করিয়ে দেয় একটা বদ্ধ জায়গায়। কোনো পদ আসল না নকল তা বোঝা যাবে কী উপায়ে ? না, পদটা অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে থাকতে পারে কিনা তাই দেখে। আর, এই তফাতটা ক'রে কি লাভ হচ্ছে ? না, পদটা অনুজ্ঞা ভাবের সঙ্গে থাকতে পারবে কিনা সেটা জানতে পারছি। অর্থাৎ এই চিন্তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে।

অনুজ্ঞা ভাবকে এড়ানো বা না এড়ানো যদি আসল নকল চেনার উপায় হয় তাহলে দেখাতে পারা দরকার যে এই আসল নকলের তফাতটা তৈরি করার ফলে বাঙলা ভাষার অন্য কোনো দিক বেশি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তা যদি কেউ দেখাতে পারে তাহলে এটা আর তাৎক্ষণিক

উপকল্প হয়ে থাকবে না। স্থায়িত্ব পাবে তার চেয়ে বেশি। দেখা যাবে যে এই উপকল্পের সপক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এ উপকল্প আসলে ভিত্তিহীন।

তাহলে এটার কথা উঠলো কেন? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অপদ্ধতি নিয়ে যাতে কথা বলা যায় সেইজন্যে। এটা অপদ্ধতির নমুনা।

মোট কথা, জাত তুলে বলা চলবে না যে অনুজ্ঞা দেখলে যোজকজাতি কাছ ঘেঁষতে রাজি থাকে অথবা নোঙরজাতি শত হস্ত দূরে থাকে। এটুকুই নিশ্চিত বলতে পারি যে অনুজ্ঞার সংস্রব যোজক 'যে'-র সহ্য হয়, নোঙর 'যে'-র সহ্য হয় না। এ ছাড়া বড়জোর আরো বলা চলে যে মনে হচ্ছে দুই 'যে'-র এই আচরণ-পার্থক্যের পিছনে যোজক আর নোঙরের জাতিগত প্রভেদের একটা কোনো ভূমিকা রয়েছে।

ছয়

কথা দিয়েছি যে ১ আর ২-এর 'যে'-কে যথাক্রমে যোজক আর নোঙর বলার কারণটা বলবো (এক); এবং কথা দিয়েছি দেখাবো যে 'কারণ' একটা যোজক (পাঁচ)। এবার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।

যোজকের কাজ যুক্ত করা। যাদের সে যুক্ত করে বা জোড়ে তাদের মাঝখানে বসে সে।

২৫। যদু আর মধু

যোজক 'যে' দুই অঙ্গবাক্যকে যুক্ত করে।

১। আমি একথা জানতাম যে ও আসবে না

একটা অঙ্গবাক্যকে সে আরেকটা অঙ্গবাক্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় না। ২৬ বলা চলে না।

২৬। আমি একথা যে ও আসবে না জানতাম

'কারণ'-ও যোজক। ২৭ বলি, ২৮ বলি না।

২৭। ওরা অনেকেই এসেছে কারণ রাম ওদের ডেকেছে
২৮। ওরা অনেকেই কারণ রাম ওদের ডেকেছে এসেছে

তবে, ২৯ বলতে বাধা নেই।

২৯। ওরা অনেকেই রাম ওদের ডেকেছে ব'লেই এসেছে

আমরা ২৯ দেখে বুঝি যে এক অঙ্গবাক্যের ভিতরে আরেক অঙ্গবাক্য ঢোকানো বাঙলার স্বভাববিরুদ্ধ নয়। কাজেই ২৮-এর দোষ নিশ্চয়ই এই যে, যোজক 'কারণ'কে দিয়ে ২৮ অযোজকের কাজ করিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। ঠিক যেমন যোজক 'যে'-কে দিয়ে অযোজকের কাজ করাতে চেয়েছিল ব'লে ২৬ দাঁড়াতে পারেনি।

নোঙর দরকারমতো ফেলা যায় জাহাজের নীচে যেকোনো জায়গায়। এজন্যেই ওই চিত্রকল্পের প্রয়োগ। একটা অঙ্গবাক্য জাহাজের মতো। তাকে বলা যাক আশ্রিত। সে নোঙর ফেলে সমুদ্রতুল্য আরেক অঙ্গবাক্যে (আশ্রয়দাতা অঙ্গবাক্যে) আশ্রয় নেয়।

৩০। ও-যে আসবে না, আমি এ খবরটা কাউকেই জানাইনি
৩১। আমি কাউকেই ও-যে আসবে না এ খবরটা জানাইনি।

এই দুটো বাক্যে 'আমি এ খবরটা কাউকেই জানাইনি' হ'লো আশ্রয়দাতা অঙ্গবাক্য এবং 'ও আসবে না' হ'লো আশ্রিত অঙ্গবাক্য। অঙ্গবাক্য-দুটোর সম্পর্ক-স্থাপক পদ 'যে'। এই পদকে বলবো আশ্রয়িক। আগে নোঙর বলেছি; সে ছিল এক পরিচয়। এখন আশ্রয়িক বললাম; এ আরেক পরিচয়।

আশ্রিত অঙ্গবাক্যকে নোঙর যে ভাবে আশ্রয় পাইয়ে দেয় সেটা ছাড়াও আশ্রয়ের (সাবর্ডিনেশনের) ব্যবস্থা হয়। ১-এও বলতে পারি যে 'ও আসবে না' আশ্রিত অঙ্গবাক্য আর 'আমি একথা জানতাম' আশ্রয়দাতা।

যোজক 'যে' এখানে আশ্রয়িক। আশ্রয়দাতার অন্দরে ঢোকা গেল না, সদরে এক প্রান্তে আশ্রয় নিতে হ'লো, কারণ ১-এ আশ্রয়িক পদটা যোজক। ৩১-এ আশ্রিত ঢুকে গেছে আশ্রয়দাতার অন্দরে, কারণ ৩১-এর আশ্রয়িক নোঙরজাতীয়।

আশ্রয় ব্যাপারটা বোধ হয় ব্যাখ্যা না করতেই বোঝা যায়। ১-এ এবং ৩১-এ আশ্রয়দাতা অঙ্গবাক্যের মানেটাই বড়, আশ্রিত অঙ্গবাক্যের মানেটা যেন তার অধীনে কাজ করছে, এইরকম লাগে। এই হ'লো আশ্রয়। আমরা অনেকে ইস্কুলে শিখেছিলাম যৌগিক বাক্য আর জটিল বাক্যের কথা। জটিল বাক্য এইজন্যেই জটিল হয় যে, তার এক অঙ্গবাক্য আরেক অঙ্গবাক্যের আশ্রয়দাতা।

অঙ্গবাক্যদের মধ্যে যদি সম্পর্ক হয় সমানে-সমানে, তখন বলতে পারি সংশ্রয় (কোঅর্ডিনেশন)।

৩২। তুমি যেন বলো আর আমি যেন শুনি

এই বাক্যের দুই অঙ্গবাক্য 'তুমি যেন বলো', 'আমি যেন শুনি'—পরস্পরের সংশ্রিত এবং সংশ্রয়দাতা। সম্পর্কটা প্রতিসম (অর্থাৎ দু দিক থেকেই একই-রকম সম্পর্ক ; সিমেট্রিকাল)। দুই অঙ্গবাক্যই সমান প্রধান। এদের যোজক 'আর' পদটা আশ্রয়িক নয়, সংশ্রয়িক। প্রচলিত পরিভাষায় বলি যে ৩২ জটিল বাক্য নয়, যৌগিক বাক্য। আশ্রয় হ'লে জটিল। সংশ্রয় হ'লে যৌগিক।

সাত

কী দাঁড়ালো তা হ'লে ?

	সংশ্রয়িক	আশ্রয়িক
নোঙর	?	-যে, -কি
যোজক	এবং, অথবা	যে, কারণ

ছকে একটা ফাঁক থাকছে। নোঙর-কি সংশ্রয়িক হ'তে পারে ?

তত্ত্বে আটকায় না। নোঙর কিনা, এ প্রশ্ন করার ধরন এক। সংশ্রয়িক কিনা, এ প্রশ্ন করার ধরন অন্য। দুই প্রশ্নের উত্তর দু দিকে যেতেই পারে।

নোঙর আর যোজক আলাদা করি চলা-ফেরা দেখে। যোজক যাদের

যুক্ত করছে তাদের মধ্যবর্তী সেতু হ'য়ে সে স্থাণু থাকে। নোঙর যে অঙ্গবাক্যের নোঙর তার যে-কোনো অংশের গায়ে হাইফেন লাগিয়ে সে জলে নেমে যায়।

আশ্রয় সংশ্রয় বুঝি মানেটা লক্ষ ক'রে। দুই অঙ্গবাক্যের অর্থপ্রাধান্য সমান থাকলে সংশ্রয়, নইলে আশ্রয়।

অতএব সংশ্রয়িক নোঙর থাকতেই পারে। আছেও হয়তো। ৩৩ এই প্রসঙ্গে বিবেচনাপ্রার্থী।

৩৩। পাড়ার লোক-তো চ'টে গেছেই, বাড়ির লোকই-বা ভাববে কী?

মনে হচ্ছে ৩৩-এর মতো দৃষ্টান্তের বেলায় হয়তো বলা চলে যে এদিকে 'তো' আর ওদিকে 'বা' সংশ্রয়িকের কাজই করছে। ৩৩-এ দুই অঙ্গবাক্যের অর্থ ই যেন 'সমান প্রধান' বা 'সমান অপ্রধান'। যদি ঠিক করি সমান অপ্রধান না বলে সমান প্রধান বলাই ভালো তাহলে ছকটা এই দাঁড়াবে—

৩৪।	সংশ্রয়িক	আশ্রয়িক
নোঙর	-বা, -তো	-যে, -কি
যোজক	এবং, অথবা	যে, কারণ

আমার সাম্প্রতিক এক ইংরেজি লেখার ('বাঙলা ইকুয়েটিভ্‌স্, কমপ্লে-মেণ্টাইজার্স, ফাইনাল ফোসাই, অ্যাণ্ড রুট্‌স্', লিঙ্গুইষ্টিক অ্যান্যালিসিস ১১ : ২, ২০৩-২৩৫, ১৯৮৩) ২২৪ পৃষ্ঠায় যে ছক দিয়েছি তাতে বলেছি নোঙর মাত্রেরই কাজ আশ্রয়িকগিরি। সেই কথাটা প্রত্যাহার করতে হয় ৩৪ মানলে। প্রত্যাহার করলেও ইংরেজি লেখাটার প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত বজায় থাকে। সে সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে অবশ্য বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের যোগ সামান্য। আপাতত ধ'রে নিই যে ৩৪-ই ঠিক। পরে, এগারো-য়, ভেবে দেখবো 'দুটো অঙ্গবাক্যই সমান অ প্র ধা ন' বললে কী দাঁড়ায়।

আট

নোঙর 'যে' আর যোজক 'যে'-র আচরণের তফাত একে একে দেখানো দরকার। দুটোই তো আশ্রয়িক, এই একটা মিল। তফাতের দৃষ্টান্ত

দিয়েছি ২১-এর আলোচনায় আর ১-এর সঙ্গে ২৬-এর তুলনা ক'রে। আর তফাত নেই ? আছে বইকি।

৩৫। রাম এমন পিছনে লাগলো যে শ্যাম রেগে গেলো

৩৬। শ্যাম-যে রেগে গেলো রাম এমন পিছনে লাগলো

আমরা ৩৫ বলি, ৩৬ বলি না। ফলবাচক অঙ্গবাক্যের আশ্রয়িক হ'তে যোজক 'যে'-ই পারে, নোঙর 'যে' পারে না। দুই 'যে'-র মধ্যে এই তৃতীয় তফাত।

চতুর্থ তফাত, প্রশ্নের পর প্রশ্ন-স্পষ্ট-করা অঙ্গবাক্যকে আনতে পারে যোজক 'যে' ; নোঙর 'যে' পারে না। ৩৭ বলি, ৩৮ বলি না।

৩৭। বিনোদ কে যে আমরা বিনোদের কথা শুনবো ?

৩৮। আমরা-যে বিনোদের কথা শুনবো বিনোদ এমন কে ?

কেউ-কেউ 'শুনবো'-র পর একটু থেমে নিয়ে ৩৮ বলতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করবো না। দুই 'যে'-র তত্ত্বের সমর্থনে ৩৭-৩৮-তো একা দাঁড়িয়ে নেই ; অন্য যুক্তিগুলো দেখুন না।

পঞ্চম তফাত, যে আশ্রিত অঙ্গবাক্যে 'কিনা' আছে সে হয় কোনো আশ্রয়িকই নেয় না (৩৯), নয়তো, কারো কারো বাঙলায়, যোজক 'যে'-কে গ্রহণ করে (৪০), কিন্তু নোঙর 'যে'-কে সহ্য করে না (৪১ কেউ বলে না)।

৩৯। আমরা জানতাম না আজ খেলা হবে কিনা

৪০। আমরা জানতাম না যে আজ খেলা হবে কিনা

৪১। আজ-যে খেলা হবে কিনা তা আমরা জানতাম না

ষষ্ঠ তফাত, যোজক-পড়শী যোজকের সহ্য হয় না ব'লে যোজক 'এবং'-এর পাশে যোজক 'যে' বসতে পারে না (৪২ বাঙলা নয়) ; কিন্তু, একটু ফাঁক দিয়ে ৪৩ উচ্চারণ করলে, নোঙর 'যে' মোটামুটি পারে যোজক 'এবং'

এর প্রতিবেশী হ'তে। ৪৩ খুব একটা ভালো বা স্বাভাবিক বাঙলা নয় ঠিকই, কিন্তু ৪২-এর তুলনায় ৪৩ স্বাভাবিক। যতই ফাঁক দিই, কমা বসাই, ৪২ কিছুতেই বাঙলা-বাঙলা শোনায় না।

৪২। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে রাম আসবে এবং যে খেলা হবে

৪৩। রাম আসবে-যে, এবং খেলাও-যে হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই

সপ্তম তফাত, বিশ্বাসবাচক অঙ্গবাক্যের আশ্রিত অঙ্গবাক্যের আশ্রয়িকের কাজ করতে যোজক 'যে'-ই এগিয়ে আসে, নোঙর 'যে' আসে না। ৪৪ বলি, ৪৫ বলি না।

৪৪। আমার মনে হয় যে ওরাই জিতবে

৪৫। ওরাই-যে জিতবে আমার তা (তাই, এমন) মনে হয়

নয়

নোঙর 'যে' আর যোজক 'যে'-র মধ্যে সাত-সাতটা তফাত আছে; এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অসুবিধে হয় 'যে' নিয়ে চলন্তিকার সংকলক রাজশেখর বসু যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে একমত হতে। উনি চলন্তিকায় লিখেছিলেন, 'যে' বলে একটা 'অ.' অর্থাৎ অব্যয় আছে যার প্রয়োগ 'বাক্য বা বিষয় উল্লেখে ("সে বলিল যে দোকান বন্ধ। সে-যে আসবে না তা জানি")। হেতু-নির্দেশে ("তুমি-যে আনতে বললে তাই এনেছি")। অসম্ভাবিত ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশে ("বৃষ্টি এল-যে! তুমি-যে বড় গেলে না?")। আধিক্যসূচক ("যে বৃষ্টি!")' ('যে'-র বাঁ দিকের হাইফেনগুলো আমার সংযোজন)।

প্রথম প্রয়োগ নাকি 'বাক্য বা বিষয় উল্লেখে'; তার নমুনা শুনছি ৪৬ আর ৪৭।

৪৬। সে বলিল যে দোকান বন্ধ

৪৭। সে-যে আসবে না তা জানি

চলন্তিকায় যাকে অব্যয় 'যে'-র প্রথম প্রয়োগ ভাবা হয়েছে সেটা (বর্তমান প্রবন্ধের দৃষ্টিতে) আসলে দুটো প্রয়োগ — ৪৬-এ যোজক হিসেবে, ৪৭-এ নোঙর হিসেবে।

আরো লক্ষ করা দরকার যে 'বাক্য বা বিষয় উল্লেখে' নোঙর 'যে'-র প্রয়োগ 'হেতু-নির্দেশে' তার প্রয়োগ থেকে তেমন কিছু আলাদা নয়। যদি বলি ৪৮—

৪৮। ডাক্তার-যে এতক্ষণ ধ'রে বাজে বকলেন এটাই রোগীর জ্বর বেড়ে যাওয়ার কারণ।

—তা হ'লে সেটা বিষয় উল্লেখ না হেতু-নির্দেশ? হেতু হ'লেই অবিষয়? এবং, হেতু-নির্দেশে যোজক 'যে'-রও প্রয়োগ পাই—

৪৯। তুমি আমার চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমাকে চিঠি লিখিনি

সূক্ষ্মচেতা পাঠক হয়তো আপত্তি ক'রে বলবেন যে ৫০-এর মতো প্রকৃত হেতু-নির্দেশের ধরনটা ৪৮ বা ৪৯ থেকে আলাদা।

৫০। তুমি-যে আনতে বললে, তাই এনেছি

এ আপত্তিটা তুলতে হ'লে কিন্তু 'বললে'-র পর ওই কমাটা বসানো দরকার। এবং 'বললে'-র 'লে' দলটাকে 'বোল্' দলের চেয়ে একটু উঁচু স্বরে ধরা দরকার। ওই আরোহী স্বরটা আনলে, মানছি, ৫০-এর 'যে' অন্যরকম হয়ে যায়। ৪৮ বা ৪৯-এর মতো আর থাকে না। কিন্তু তা হ'লে ৫১-র মতো দৃষ্টান্তের দিকেও মন দিতে হয়।

৫১। ডাক্তার-যে এতক্ষণ ধ'রে বাজে বকলেন (আরোহী স্বরে উচ্চারিত 'বকলেন', তারপর, একটু থেমে), এটাই রোগীর জ্বর বেড়ে যাওয়ার কারণ।

আসল কথা, ওই আরোহী স্বর থাকায় কমাটা দুই বাক্যের মধ্যেকার সীমাচিহ্ন হ'য়ে উঠতে উৎসাহ পায়। ফলে ব্যাপারটা যেন—

৫২। তুমি-যে আনতে বললে?

৫৩। ডাক্তার-যে এতক্ষণ ধ'রে বাজে বকলেন?

—এইরকম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাক্যের মতো হ'য়ে দাঁড়ায়। এটা-তো রাজশেখর যে তৃতীয় প্রয়োগ উল্লেখ করেছেন সেই 'অসম্ভাবিত ঘটনার বিস্ময় প্রকাশে' প্রয়োগের অনুরূপ।

অর্থাৎ নোঙর 'যে'-র আশ্রয়িক প্রয়োগ আর বিস্ময়বাচক প্রয়োগের মাঝখানে কঠিন কোনো সীমারেখা নেই। নোঙর 'যে' তার বাক্যকে বিশিষ্ট-ভাবে উল্লেখ করে। এই উল্লেখ করাটা একা দাঁড়ালে বিস্ময় বোঝায় (অথবা বোঝায় ঘটনাটার বিশিষ্টতা—'তুমি-যে এসেছ মোর ভবনে' ঠিক বিস্ময়োক্তি নয়, বিশিষ্টতার স্বীকৃতি)। উল্লেখ করাটা যদি অঙ্গবাক্য হিসেবে স্থান পায় বৃহত্তর বাক্যে, তখন বৃহত্তর বাক্যসংস্থান কী দাঁড়াবে সেটা নির্ভর করে অন্য অঙ্গবাক্যের উপর।

এতক্ষণ আমরা এমন সব দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছি যেখানে অন্য অঙ্গবাক্যটা আশ্রয়দাতাজাতীয় ব'লে নোঙর 'যে' আশ্রয়িকের কাজ করে এবং তার অঙ্গবাক্যটা আশ্রয়দাতার আশ্রয় নেয়।

কিন্তু অন্য অঙ্গবাক্যটা যদি অতিথিবৎসল না হয় তা হ'লে দুই অঙ্গবাক্য পরস্পরের পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, যেমন—

৫৪। মাংস-যে কাটবে, তোমার ছুরিটা-তো ভোঁতা

৫৪-য় বোধহয় দুটো অব্যয়ের প্রয়োগ হচ্ছে 'বিষয় উল্লেখে'। 'যে'-র সাহায্যে উল্লেখ করছি মাংস কাটার প্রসঙ্গ। আর 'তো' সাহায্য করছে ছুরির সমস্যা উল্লেখের কাজে। দুটোই উল্লেখ বা উত্থাপন। কোনোটাই যেন ঠিক স্বনির্ভর উক্তি নয়। কোনোটারই তাই শক্তি নেই অন্যটাকে আশ্রয় দেবার। অর্থাৎ ৩৪ মানলে বলবো এখানে বৃহত্তর বাক্যটা যৌগিক; অঙ্গবাক্য-দুটো পরস্পরসংশ্রিত; এদিকে 'যে' আর ওদিকে 'তো' সংশ্রয়িক

নোঙর হিসেবে কাজ করছে। যাঁরা ৩৪-এর পক্ষপাতী তাঁরা ছকে ঢুকিয়ে দিন—সংশ্রয়িকে কাজ নোঙর '-যে'-ও পারে, দরকার হ'লে। ৩৪-এর বিরোধীরা এগারো দেখুন।

এ ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে হ'লে অনুভবের উপর নির্ভর ক'রে এগোতে হয়। পরে যুক্তির সাহায্যে যাচাই ক'রে নেওয়া যায়, অনুভবনির্ভর কথা যা বলা হ'লো তা বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড়াচ্ছে কিনা, কথাগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলছে বা ফলপ্রসূ গরমিলের আপাত-লড়াই বাধাচ্ছে কিনা। অনুভবে মনে হচ্ছে চলন্তিকার চতুর্থ প্রয়োগ ('যে বৃষ্টি !') সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, বর্তমান আলোচনায় উপেক্ষণীয়। যাঁদের অনুভব অন্যরকম তাঁরা একথায় সুচিন্তিত, যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করবেন নিশ্চয়।

দশ

রাজশেখর যে তিনটে প্রয়োগ আলাদা করেছেন সেই ত্রিভাজন মানা কঠিন। আলোচিত বা পরিচিত বিষয়ের উল্লেখ সূচিত করা যদি নোঙর 'যে'-র কাজ হয়, তাহলে তিনটে প্রশ্নের জবাব পাই।

৫৫। এই নোঙর যে অঙ্গবাক্যের অন্তর্গত সে পারলেই বাঁ দিকে বসে কেন ? বসে তার কারণ, জানা কথা থেকে অজানা কথায় যাওয়াই বাক্যের স্বভাব। নোঙর 'যে' যদি জানা কথার সূচক হয় তা হ'লে যে-ওয়ালা অঙ্গ-বাক্য-তো যথাসম্ভব বাঁ দিক ঘেঁষে বসবেই।

৫৬। নোঙর 'যে' কেন আশ্রয়িক হ'তে পারে ? পারে কেননা একটা উল্লেখবাচক অঙ্গবাক্যের নিজের বক্তব্যের জোর কম। তাকে আশ্রয় দিতে পারে এমন অঙ্গবাক্যের সংস্পর্শে এলেই সে আশ্রয় নেবে, এটাই স্বাভাবিক।

৫৭। নোঙর 'যে' কেন সংশ্রয়িক হ'তে পারে ? পারে এইজন্যে যে উল্লেখবাচক অঙ্গবাক্যের গায়ের উপর আরেকটা উল্লেখবাচক অঙ্গবাক্য যদি এসে পড়ে (যেটা ৫৪-য় ঘটেছে) তাহলে বাধ্য হ'য়ে দুই অঙ্গবাক্যই নিরাশ্রয় হ'য়ে থাকে ; তাই সংশ্রয়ের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়।

অর্থাৎ, পদ হিসেবে 'যে'-র কাজ একবার আশ্রয়িকের, একবার সংশ্রয়িকের, এমন নয়। পরিচিত (অথবা, পরিচিত ব'লে ধ'রে নেওয়ার কারণ

থাকতে পারে এমন) বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এ বিষয় নিয়ে কিছু বলবার বা ভাববার থাকতে পারে—এটাই নোঙর 'যে'-র নিজস্ব মানে। সেই অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে, বাকি বাক্যের সংস্থানে তফাত হওয়ার ফলে, নোঙর 'যে' আপাতদৃষ্টিতে নানারকম ভূমিকায় নামে।

এগারো

এখানে ব'লে রাখা দরকার যে আমি এখনো মন থেকে ৩৩ বা ৫৪-কে দস্তুরমতো যৌগিক বাক্য বলে মানতে পারছি না পুরোপুরি। একই কথা আরেকভাবে বলতে পারি—৩৩ বা ৫৪-য় '-তো, -বা, -যে'-র ভূমিকাটাকে মন থেকে ঠিক সংশ্রয়িকের ভূমিকা ব'লে ভাবতে পারছি না।

কারণ, খেয়াল করুন, ৩৩ বা ৫৪-য় ভারসাম্যের ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্ম। বাঁ দিকে '-তো', ডান দিকে '-বা'। বাঁ দিকে '-যে', ডান দিকে '-তো'। অথচ সংশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য হ'লো উভয় অঙ্গবাক্যকে সমান মূল্য দেওয়া, একই ধরনের মূল্য (৩২-এর আলোচনায় প্রতিসাম্যের কথা তুলেছিলাম)। ৩৩-এ (বা ৫৪-য়) অঙ্গবাক্য-দুটো যেন দু ধরনের ; কাজেই স মা ন মূল্য দেওয়া হচ্ছে কিনা এ প্রশ্নটাই তোলা মুশকিল। দুটো আশ্রয়প্রার্থী অঙ্গ-বাক্য, আশ্রয় পেলো না, বাধ্য হ'য়ে পরস্পরের গায়েই হেলান দিচ্ছে, কোনো সক্ষম আশ্রয়দাতা পায়নি ব'লে—এটাকে সংশ্রয় ভাবা হয়তো ভুল। ৩৩ বা ৫৪ হয়তো যৌগিক নয়, এরকম জটিল বাক্য—যার অঙ্গবাক্য-দুটো পরস্পরের আশ্রিত। এই প্রস্তাব মানলে ৩৪ ভুল, ৩৪-এর নিচে উল্লিখিত আমার ইংরেজি লেখাটাই ঠিক, সব নোঙরই আশ্রয়িক। সেক্ষেত্রে ৫৭-য় উত্থাপিত প্রশ্নটা ওঠে না, কারণ নোঙর 'যে' (বা কোনো 'যে'-ই) সংশ্রয়িক হয় না কখনো।

লেখার এই অংশে যে বিকল্প প্রস্তাব পেশ করছি এটা স্পষ্টতই বাকি লেখাটার একাধিক অংশের বিরোধী। এই প্রস্তাবটা ভালো না বাকি লেখার উপস্থাপনটাই ভালো তা নিয়ে আরো ভাবা দরকার। বিশদভাবে সে চিন্তা করতে চাইলে এনে ফেলতে হবে আরো অনেক প্রসঙ্গ—

৫৮। হয় রেগে যাবো নয় ফাজিল হ'য়ে যাবো

৫৯। আমিও যাবো না তুমিও যাবে না

৬০। না ঘর কা না ঘাট কা

৬১। পাড়ার লোকই রেগে গেছে, বাড়ির লোকের আর কী দোষ

হয়-নয়, ও-ও, না-না, ই-আর—এসব জুটিবাঁধা উপাদান যোজক কিনা, সংশ্রয়িক কিনা, এসব প্রশ্ন আমি বর্তমান লেখায় তুলবো না, স্পষ্টতই। তুললে চিন্তা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবে। যোজক আর নোঙর এই ধারণা-দুটো আশা করি একরকম দাঁড় করাতে পেরেছি। দেখাতে চেষ্টা করেছি যোজক 'যে' আর নোঙর 'যে'-র সামান্য মিল আর বহু গরমিল। আশ্রয় আর সংশ্রয়ের কথাটা তুলেছি এবং কিছুদূর স্পষ্টও করতে পেরেছি; একটা বিশেষ ব্যাপারে অমীমাংসা র'য়ে গেলো, কিন্তু সেই দ্বিধার সূত্রগুলো স্পষ্ট। অব্যয় ব'লে যে বিরাট এলাকা প'ড়ে আছে তাতে কাজ করতে হ'লে একেকটা খেত বেছে নিয়ে চাষ করতে হবে। অব্যয় ব'লে কোনো একটা খেত নেই, খেত অনেকগুলো। একসঙ্গে সব খেতে কাজ করতে গেলে কোথাও ফসল ফলবে না। ধৈর্য দরকার এবং একেকটা প্রশ্ন নিয়ে বারবার নানা দিক থেকে ভাবা দরকার। তাই এখানে থামলাম। আশা করি অন্তত 'তো' নিয়ে অরুণ ঘোষের প্রবন্ধের সঙ্গে আমার এ লেখা মিলিয়ে দেখে কোনো কোনো পাঠক বুঝে নিতে চাইবেন, বাঙলা বাক্যে নোঙরের ভূমিকা আগের চেয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিনা আমাদের দু ধরনের আলোচনায়।

বৈজ্ঞানিক কল্পনার ভগীরথের ভূমিকায় চমস্কি

এক

আমরা মানুষ, অতএব মানবিকবিদ্যার বিষয়বস্তু আদতে সবটাই আমাদের নাগালে, এ ধরনের একটা বিশ্বাস খুবই প্রচলিত। মাঝে মাঝে বাইরের বিশ্ব কথাটা ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে অন্তর্জগতের একটা কোনো সীমারেখা ধ'রে নিয়ে। ওই সীমারেখারও মূলে সেই একই বিশ্বাস। মানুষের কথা মানুষের বোধগম্য। বুঝতে চাইলেই বোঝা যায়। যা মানুষ বোঝে না, না বুঝতেই পারে, তা হ'লো মনুষ্যেতর বহির্জগৎ, বিশেষ ক'রে জ্যোতিষ্ককীর্ণ এবং অণোরণীয়ান পদার্থচরাচর।

কিন্তু শরীরের বেলা ? শরীরের তাবৎ কথাই তো আমরা বুঝতে চেয়েও বুঝি না, কে না জানে। মানুষের শরীর কি তবে অন্তর্জগতের নয় ? প্রশ্নটার একটা সুবিধাবাদী জবাব ধ'রে নেয় আস্তিক নাস্তিক সবাই : 'আমরা শরীর নই, আমাদের শরীর আছে ; সেই শরীর, হ্যাঁ, বহির্বিশ্বেরই'। একমাত্র 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি'-বাদী সুকুমার রায়রাই বলবার সাহস রাখেন যে শরীর আমাদের নয়, আমরা শরীরের। এবং সে সাহসটাও প্রকাশ করেন আলগোছে, কথার কথা বলবার ভঙ্গীতে।

অবশ্য একদিক থেকে সবাই ধ'রেই নেয় যে 'মানুষের কথা মানুষ বোঝে' সূত্রটা প্রায়ই সোজাসুজি বাস্তব অবধি পৌঁছয় না, মধ্যস্থরা পৌঁছে দেন। যেমন, মুনাফাখোর উচ্চবিত্ত শ্রেণী বা উপনিবেশবাজ বিজাতি যাদের ওপর প্রভুত্ব খাটায় সেসব মানুষের কথা তারা মানুষ হ'য়েও নিজে থেকে তেমন বুঝে উঠতে পারে না, যতদিন না অবমানিত সম্প্রদায়ের সফল সংগঠক আর যোদ্ধারা, মধ্যস্থতা (এক্ষেত্রে সংগঠন বা সংগ্রাম) ক'রে, কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে ছাড়েন। তাঁরা না থাকলে 'মানুষের কথা মানুষ বোঝে' সূত্রের সর্বজনীনতার ব্যত্যয় ঘটতেই থাকতো।

রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও 'মানুষের কথা মানুষকে বোঝানোর' কাজের আরো এক রকম কর্মী উল্লেখ্য : শিল্পী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা

কমলকুমার মজুমদার যা ক'রে গেছেন, তা যদি অকৃত র'য়ে যেতো তাহলে মানুষের অনেক কথা অনেক মানুষ বুঝতে শিখতো না কোনো দিনই। বিশেষ মনোযোগ্য উদাহরণ খুঁজে নিতে গিয়ে আরো একটা খুব সাধারণ দৃষ্টান্ত চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিলো আরেকটু হ'লে—সাংবাদিক। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মনে হ'তে পারে যে এই আলোচনায় বিদ্বানকেও স্থান দেওয়া উচিত চতুর্থ দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু বিদ্যার যাঁরা স্রষ্টা বা বণ্টনকারী তাঁরাও কার্যত নেতৃত্ব, শিল্প আর সংবাদ-দানের কাজগুলো মিশিয়েই কথা বলেন বা লেখেন।

মার্ক্স হয়ত এর সবচেয়ে উপযুক্ত নমুনা। উনি তো আক্ষরিক অর্থে সাংবাদিকতা ক'রেই পেট চালিয়েছিলেন কিছুদিন। রাজনৈতিক সংগঠক আর সংগ্রামী হিসেবে ওঁর কাজের কথাও লোকে জানে। আর শিল্পী ছিলেন মার্ক্স অন্তত দু অর্থে। এক, আখ্যানমূলক লেখায় উনি যে কোনো সুরচয়িতা ঐতিহাসিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন মনোজ্ঞ উপস্থাপনের ক্ষমতায়। দুই, ওঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রেখায় রেখায় কল্পনার দূরদৃষ্টির সঙ্গে অশিথিল আনুপুঙ্খিক পরিশ্রমের যে সন্মিতি দেখি তা তত্ত্ব-শিল্পীর হাতের কাজ।

বৈজ্ঞানিক হ'তে গেলে কতখানি কল্পনাশক্তি থাকা জরুরি তা অনেকেই মনে রাখেন না। হয়ত এর একটা কারণ বিজ্ঞানের অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে প্রযুক্তি প্রায়ই গুলিয়ে যায়—যদিও এ কথা ব'লে প্রযুক্তিবিদদের প্রতি অবিচার করছি। প্রযুক্তিতেও তো কল্পনাশক্তি লাগে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিশেষ ক'রে যেগুলো বড় আকারের সেগুলো, ব্যক্তিগত কল্পনার ফসল। 'মন-গড়া', কল্পনায় গ'ড়ে তোলা তত্ত্বমূর্তির জটিলতার সঙ্গে জগতের বাস্তব জটিলতা মিললো কিনা তাই দেখে বিজ্ঞানীরা প্রস্তাবিত তত্ত্বের যাথার্থ্য যাচাই করেন। বিজ্ঞানী তত্ত্ব তৈরি করলেন, সে একরকম সৃষ্টিকর্ম। সেখানে একক ব্যক্তিগত কল্পনা (অবশ্য যৌথ কল্পনার স্থান নেই তা নয়)। অন্য বিজ্ঞানীরা সেই প্রস্তাবিত তত্ত্বের তথ্য-সঙ্গতি যাচিয়ে নিয়ে তত্ত্বটাকে বরণ বা বর্জন করবেন, সে আরেক রকম কাজ। সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বহুপার্শ্ব পরীক্ষা।

পরীক্ষণের ধরণটা ঠিক কী সে বিষয়ে কয়েকটা কথা সম্প্রতি পরিস্ফুট

হ'য়ে উঠেছে। এই স্পষ্টতার দৌলতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে 'সাংবাদিকতার' তুলনায় 'শিল্পের' কতখানি গুরুত্ব তা আগের চেয়ে ভালো বুঝতে পারা গেছে। যেমন আমরা এখন জানি যে বৈজ্ঞানিক মহলে যখন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সাড়া তুলেছে সে সময়কার প্রাপ্তব্য উপাত্ত ওই তত্ত্বের 'সাংবাদিক' দিকের পক্ষে এজাহার দেয়নি। বিজ্ঞানীদের মন জয় যা ক'রে নিয়েছিলো তা হ'লো আইনস্টাইনের তত্ত্বের 'শিল্প'। ১৯০৫ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে যে সব তথ্য মজুদ ছিলো তৎকালীন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানী লরেন্ৎসের তত্ত্বে সেগুলোর ব্যাখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক। তথ্যসংগতির যুদ্ধে জেতেননি আইনস্টাইন। অর্থাৎ ওঁর তত্ত্বের যে 'সাংবাদিক' দিক, যে দিকটার কাজ পদার্থ-জগতের একেকটা ব্যাপারের ঠিকমতো মাপজোখ বাতলানো, সেই দিকটার বিচারে ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব ছিলো শাস্ত্রীয় পদার্থবিজ্ঞানের তুল্যমূল্য। কিন্তু সমকালীন পদার্থবিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের কাজে তত্ত্বরচনাশিল্পের পূর্ণমনস্কতা দেখতে পেয়েছিলেন। একই তথ্যরাজি আইনস্টাইনের তত্ত্বে যে নতুন রীতিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব তার তুলনায় ওইসব তথ্যের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নিরেস ঠেকলো। পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মনে হ'লো, শাস্ত্রীয় পদার্থবিজ্ঞানে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন লরেন্ৎস, তাঁর তত্ত্বের তুলনায় আইনস্টাইনের তত্ত্বে আছে চিন্তার অগ্রসরণ আনবার পূর্ণাঙ্গতর শক্তি। এ রকম মূল্যতুলনা সংকীর্ণ অর্থে 'বৈজ্ঞানিক' বা 'তথ্যাশ্রয়ী' যাথার্থ্যতুলনা নয়, যদিও একমাত্র অবহিত বিজ্ঞানীই এমন মূল্যতুলনা করতে পারেন। তুলনাটা নান্দনিক।

অর্থাৎ এমনকি প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গ্রাহ্যতা নির্ণয়ের কাজেও বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত কল্পনাশ্রিত সৌন্দর্যবোধের উপরেই নির্ভর করেন।

পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাজগতে যে রকম তত্ত্বরচনাশিল্পন আন্দোলিত সে ধরনের শিল্পনের অত্যন্ত অভাব ছিলো ভাষাবিজ্ঞানের চিন্তাজগতে। ব্যাকরণের তো নীরস ব'লে বদনাম আছেই। বৈয়াকরণের আবার কল্পনা!

দুই

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোআম চমস্কি অঘটন ঘটিয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানে তিনি পূর্ণাঙ্গ ঐশ্বর্যবান তত্ত্বরচনাশিল্পন চালু করেছেন—নিজের কাজে তো

বটেই, অন্যদের কাজেও এই শিল্পন এসেছে অনেকটাই ওঁর প্রবর্তনায়। এই ঘটনাকে অনেকে 'চমস্কি বিপ্লব' বলেন।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তত্ত্বশিল্পনের রীতির আস্বাদ দেবার চেষ্টা করবো এই লেখায়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ভাবনার যন্ত্রপাতি ঠিক কোথা থেকে এসেছে, চমস্কির নিজের চিন্তারই বা কী ধরনের বিবর্তন ঘটেছে গত বাইশ বছরে, সে সব নিয়ে অন্যত্র আলোচনা হয়েছে এবং হবে। এখানে ওরকম জট এড়িয়ে চলতে চাই। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের 'সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব ও বাঙলা ভাষাবিচারে তার প্রয়োগ' [রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৬ (১৯৭৯), সংখ্যা ৪, পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৮৫] নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন।

প্রথমে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল কথাগুলো ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

ভাষা সারাক্ষণই পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, যদিও সে পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি ঘটে না যে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাবো। তবে কৃত্তিবাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করলে তফাতটা টের পাই ভালো ক'রেই। চোখের সামনে যা দেখতে পাই তা হ'লো সমভাষী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন এলাকায় ভাষার বিচিত্র রূপ। ভাষার পরিবর্তন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন অভিমুখে ঘটে ব'লেই এভাবে উপভাষা আলাদা আলাদা হ'য়ে যায়, যশোরের সঙ্গে বর্ধমানের তফাত কানে ধরা পড়ে। স্থান-কাল-ভেদেই ভাষা বদলায় না। পাত্র-ভেদেও বদলায়। ভাষী কোন সামাজিক শ্রেণীর, বয়স্ক না বাচ্চা, পুরুষ না মহিলা, তা-ও ভাষা থেকে অনেকটা বোঝা যায়, যেমন বোঝা যায় ভাষীর চাল ভারিক্কি না হাল্কা, রেগে আছেন না মেতে আছেন।

এই যে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ভাষার ভেদ এগুলোকে বলতে পারি নানা আয়তনের তারতম্য। ভাষাবিজ্ঞানীর একটা কাজ হ'লো তারতম্য খতিয়ে দেখে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদের মানচিত্র আঁকা, যথাক্রমে ভূগোল ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে। এ ধরনের কাজকে বলে ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, সামাজিক ভাষাবিজ্ঞান, মানসিক ভাষাবিজ্ঞান। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, এগুলো করতে গেলে ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিষয়েও পারদর্শিতা লাগে। সব মিলিয়ে এ ধরনের কাজকে বলতে পারি তারতম্য-বিষয়ক ভাষাবিজ্ঞান।

তারতম্যের ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চাইলে প্রত্যেকটা ভাষার নিজস্ব অথচ সমগ্র ছবিটা ধরতে পারাও জরুরী। নইলে বড়োজোর উঞ্ছবৃত্তি ক'রে বলা চলে, পুব বাঙলায় 'ছ' না বলে 'স' বলে। যে কোনো একজন ভাষী যে-ভাষায় কথা বলেন (সারা জীবনের কথা ছেড়ে দিন, কোনো একটা বয়সে) তার একটা মোটামুটি ঐক্য আছে। কেউ যখন বলে 'আমি অমুক ভাষা জানি', তার অমুক ভাষা জানাটা একটা সংহত, অনুসন্ধান-যোগ্য মানসিক তন্ত্র। সেই তন্ত্রের অনেক কলকব্জার কথা সে নিজেই জানে না। ওই একই তন্ত্র তার সমভাষী আরও অনেকের মনে উপস্থিত ব'লেই একজন ভাষীর পক্ষে অন্যদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব। স্পষ্টতই আমরা একক ব্যক্তিকে নিয়ে অযথা ব্যাপৃত হবো না; অমুক ভাষীদের সাধারণ্যে বিস্তৃত যে জ্ঞানটাকে 'অমুক ভাষা জানা' বলে সেটাই অমুক ভাষার বৈজ্ঞানিক বিবরণের উপজীব্য। এই বিবরণ তারতম্যকে স্থান দেবে না। অমুক ভাষার সঙ্গে যখন তমুক ভাষা মিলিয়ে দেখবার সময় আসবে তখন তারতম্যের পালা (লক্ষ করুন 'ভাষা' কথাটা এখানে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি না। বাঙলার যে কোনো দুটো উপভাষা আমাদের দৃষ্টান্তের 'অমুক ভাষা' আর 'তমুক ভাষা' হতে পারতো যদিও সাধারণত লোকে 'দুটো আলাদা ভাষা' বলবে না, বলবে 'দুটো উপভাষা')। এতে ক'রে ভাষার তারতম্যকে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। ভাষার ঐক্যের দিকটা থেকে তার অনৈক্যের দিকটা আলাদা ক'রে দেখার সুবিধে হবে ব'লেই এরকম ব্যবস্থা।

তারতম্যের কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে ভাষাবিশেষের নিজস্ব গতি-প্রকৃতি তলিয়ে বুঝবার চেষ্টাটাই বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞান বা তারতম্য-এড়ানো ভাষাবিজ্ঞান। বারবার 'বিশুদ্ধ' কথাটা না ব'লে এরপর থেকে স্রেফ 'ভাষা-বিজ্ঞান'ই বলবো।

ভাষার যে দিকগুলো বদলায় সেগুলোই এক একটা ভাষার বৈজ্ঞানিক বিবরণে উল্লেখযোগ্য। ধরুন, আমি যে ধরনের বাঙলায় এ-লেখাটা লিখছি (এর পর থেকে এরকম ঘুরিয়ে না ব'লে স্রেফ 'বাঙলা'ই বলবো, কিন্তু ধ'রে নিতে হবে যে 'বাঙলা'-অভিধেয় অনেক কিছু এখানে অবিবেচিত) সেই বিশেষ ধরনের বাঙলার বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিখতে ব'সে কেউ উল্লেখ করবেন না যে 'বাঙলা বলার সময় মুখ দিয়ে হাওয়া বেরোয়', কারণ ও ব্যাপারটা স্পষ্টতই ভাষামাত্রেরই ধর্ম, বাঙলার একচেটে নয়। এটা স্পষ্ট।

কিন্তু এরকম অনেকগুলো ব্যাপার রয়েছে যা ভাষামাত্রেরই ধর্ম, সেগুলো মোটেই স্পষ্ট নয়, মেহনত করে আবিষ্কার করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন, জানা গেছে যে স্বরধ্বনি (ই আ উ এ-র মতো ধ্বনি) সব ভাষাতেই আছে। এটা সত্যি না হতেও পারতো। থাকতেই পারতো এমন ভাষা যার সব কথাই প্‌স্‌ ক্‌স্‌ চ্‌ম্‌ ইত্যাদি। কাজেই এ খবরটা ভাষাবিজ্ঞানের একটা খোপে পুরে রাখা দরকার। একেকটা ভাষার বিবরণে এ জাতীয় কথাকে স্থান দিলে সর্বনাশ, কারণ তাহলে হাজার হাজার বার কপচাতে হবে 'এই ভাষায় স্বরধ্বনি আছে, ওই ভাষায় স্বরধ্বনি আছে···' —তার বদলে খবরটা জমা থাকুক ভাষার 'নিত্য' ধর্মের তালিকায়। যেসব ব্যাপারে ভাষা ইতস্তত করে, যেগুলো এক ভাষায় এক রকম আর পাশের ভাষায় আর এক রকম হতে পারে, সেগুলোকে বলতে পারি অনিত্য ; যেগুলে পালটায় না সেগুলো নিত্য। ভাষার কোন কোন দিক নিত্য কোন কোন দিক অনিত্য তা এখনো কেউ জানে না। জেনে নেওয়াই ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য।

বিশ্লেষণের সুবিধে হবে ব'লে বিজ্ঞানীরা ভাষার স্তর ভাগ ক'রে নেন মোটামুটি এইভাবে : পদের ভিতরকার ব্যাকরণগত বিন্যাস বা অঙ্গবিজ্ঞান থেকে এক দিকের রাস্তা বেয়ে পেঁছিই উচ্চারণের সবচেয়ে ছোটো, অবিভাজ্য উপাদানের অধ্যয়নে—যাকে বলে ধ্বনিবিজ্ঞান—আর আরেক দিকে পাই বাক্যের এক পদের সঙ্গে অন্যান্য পদের প্রক্রিয়াকলাপ—অন্বয়। ধ্বনির বিভাজন কতদূর করা হয়েছে না হয়েছে সে এক রোমহর্ষক গল্প, কিন্তু আজ সে প্রসঙ্গ থাক। বাক্যের চেয়ে বড় মাপের জিনিষ নিয়ে সহজেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যায় ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু এপর্যন্ত কেউ খুব একটা সাফল্য লাভ করেনি, বাক্যই এখনো ব্যাকরণের সার্থক প্রগতির উর্ধ্বসীমা, ঠিক যেমন ছিল বাক্যপদীয়—রচয়িতা ভর্তৃহরির আমলে।

একদিকে ধ্বনিবিজ্ঞান, অঙ্গবিজ্ঞান, আর অন্বয় সুনির্দিষ্ট ক'রে দেয় ভাষার গড়ন। আরেকদিকে এসবের মানে কী তাই নিয়ে মাথা ঘামায় তাৎপর্যবিজ্ঞান। মাঝখানে কিছুদিন বেশ কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানী ভাবতে শুরু করেছিলেন যে অন্বয় আর তাৎপর্যবিজ্ঞানের মধ্যে বুঝি কোনো সীমা-রেখা নেই। তাঁদের 'তাৎপর্যাত্মক অন্বয়' নিয়ে কাজকর্ম বেশীদিন চলেনি। ওই বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের উদ্যোক্তারা নানারকম অন্য পথ নিয়েছেন।

সে সব পথে যতই বিভিন্নতা থাকুক, সবাই এখন নানা কারণে মানেন যে অন্বয় মোটের উপর স্বাধীন জিনিষ, তার সঙ্গে তাৎপর্যের যোগ আছে কিন্তু অভেদ নেই।

পদের অঙ্গচ্ছেদ করা মোটামুটি সোজা। যেমন, একদিকে 'কাকা কাকাকে কাকার', অন্যদিকে 'মাসী মাসীকে মাসীর', মিলিয়ে দেখে বুঝি যে এপদগুলোর অঙ্গ 'কাকা, মাসী,-কে, -র'। সমাসের বেলায় সমস্যাটা আরেকটু জটিল। যেমন ধরুন অকৃতকার্য-র অঙ্গচ্ছেদ করতে পারেন প্রথম দফায় অ-কৃতকার্য, দ্বিতীয় দফায় কৃত-কার্য, কারণ কৃতকার্য ব'লে একটা কথা আছে। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর বা অকুতোভয়-এর বেলায় ওরকম চলবে না, কারণ কিঞ্চিৎকর বা কুতোভয় হয় না। তবে এসব মুশকিলের আসান আছে, কারণ বেশির ভাগ ভাষাতেই দৈর্ঘ্যসীমা আছে সমাসের (সংস্কৃতে নেই; সংস্কৃতের মতো ভাষায় পদের অঙ্গচ্ছেদ মোটেই ছেলেখেলা নয়)। আসল মুশকিল বাধে বাক্যের গড়ন বা অন্বয় নিয়ে কাজ করতে বসলে (পরিভাষা সিধে রাখবার জন্য বাক্যের অংশকে অঙ্গ না ব'লে বলবো ভাগ)। কী ধরনের মুশকিল বাধে তার একটা সহজ নমুনা দিই। বাঙলায় 'তে'-বিভক্তি-ওয়ালা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কিসের যোগ ঘনিষ্ঠ—পরবর্তী ক্রিয়াপদের, না, পূর্ববর্তী বিশেষ্য বা সর্বনামের ? অর্থাৎ 'দিল্লীতে থাকতে চাইবে না'-র সংস্থান (১)-এর মতো না (২)-এর মতো ?

১। অজিত দিল্লীতে ((থাকতে) (চাইবে না))
২। অজিত ((দিল্লীতে) (থাকতে)) চাইবে না

এরকম প্রশ্ন যে কোনো ভাষার অন্বয়েই উঠতে পারে। এর উত্তর দেওয়ার নানা উপায়ের একটা হলো ধ'রে নেওয়া যে, বাক্যের কোনো একটা অংশ যদি এক কোপে উড়ে যেতে পারে, তাহলে সেই অংশটা সত্যিকারের ভাগ বটে। যেমন (৩) থেকে প্রথম 'থাকতে চাইবে না'-টা বাদ দিয়ে (৪) বলা যায়। কাজেই আমরা সাব্যস্ত করতে পারি যে 'থাকতে চাইবে না' একটা সংহত ভাগ বটে বাক্যের, 'টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন / তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন'—মার্কা সংহতি আছে তার। অতএব (১)-ই ঠিক, (২) নয়।

৩। অজিত দিল্লীতে থাকতে চাইবে না বা রাকা নাগপুরে থাকতে চাইবে না।

৪। অজিত দিল্লীতে বা রাকা নাগপুরে থাকতে চাইবে না।

মুশকিল হলো, এই যুক্তি দু দিকেই কাটে। (৫) থেকে স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় 'দিল্লীতে থাকতে'-টা বাদ দেওয়া যায়; (৬) বলা সম্ভব; সুতরাং (২)-ও ঠিক।

৫। অজিত দিল্লীতে থাকতে চাইবে কিন্তু রাকা দিল্লীতে থাকতে চাইবে না।

৬। অজিত দিল্লীতে থাকতে চাইবে কিন্তু রাকা চাইবে না।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে দু কূল সামলানোর জন্যে, অর্থাৎ (১) এবং (২) দুটোই যে ঠিক এটা বলতে পারার জন্যে, অন্বয়ের ভিতরে দুটো স্তর আলাদা করা দরকার—এটাই চমস্কির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। বাক্যের অন্তর্বিন্যাসে তার 'ভাগ'-সংস্থান বা 'বিভাজন' হতে পারে এক রকম, বহির্বিন্যাসের স্তরে হতে পারে আরেক রকম। কাজেই ধ'রে নিতে পারি (২) আর (১) দুটোই 'ঠিক'—যেমন ধ'রে নিই 'দিল্লীতে'-র দল-সন্নিবেশ দিল্‌-লী-তে এবং ধ্বনি-সন্নিবেশ দ্‌ইল্‌-ল্‌ঈৎএ দুটোই 'ঠিক'। (২) হলো বাক্যটার অন্তর্বিন্যাস; 'থাকতে'-কে 'চাইছে'-র সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গঠন করা হয় (১) বহির্বিন্যাস। এই পুনর্গঠনের কাজটা করে কে? 'অসমাপিকা পুনর্গঠনের নিয়ম' ব'লে একটা নিয়ম আছে যার এই কাজ। বহির্বিন্যাসে বাক্যের শেষে সমাপিকা ক্রিয়া আর তার আগের অসমাপিকা মিলিয়ে জোড় তৈরী হবার অন্য রাস্তাও আছে। যেমন (৭)-এর যৌগিক ক্রিয়া 'লিখে ফেললো' অসমাপিকা পুনর্গঠনের দৌলতে তৈরী হয়নি। তার প্রমাণ, এ বাক্যটার এমন কোনো বিন্যাস নেই যাতে ((কথাটা) (লিখে)) একটা ভাগ ব'লে গণ্য; অর্থাৎ (৮) নেই; কারণ (৮) থাকলে (৯) থেকে 'কথাটা লিখে'-র দ্বিতীয় আবির্ভাবটা বাদ নিয়ে (১০) বলা যেতো, কিন্তু (১০) বলা যায় না, সুতরাং (৮) নেই।

৭। স্বস্মিত তক্ষুনি কথাটা ((লিখে) (খেললো))

৮। স্থমিত তক্ষুনি ((কথাটা) (লিখে)) ফেললো

৯। স্থমিত তক্ষুনি কথাটা লিখে ফেললো, একটু বাদে রমেশও কথাটা লিখে ফেললো

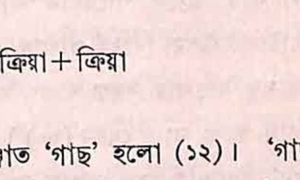
১০। স্থমিত তক্ষুনি কথাটা লিখে ফেললো, একটু বাদে রমেশও ফেললো

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যে ভাগ হিসেবে 'লিখে ফেললো'-র ঐক্য, এই ঐক্যটা এল কোত্থেকে ? স্পষ্টতই (৮) না থাকলে ধ'রে নিতে হবে যে (৭) বহির্বিন্যাসে যা অন্তর্বিন্যাসেও তাই। অর্থাৎ অন্বয়ের একদম অন্দরমহলের স্তরেও 'লিখে ফেললোর'-র ঐক্য স্বীকৃতি পায়। এই স্বীকৃতির ধরনটা বোঝাবার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীরা আর এক রকম নিয়ম প্রণয়ন করে—গঠনের নিয়ম। 'লিখে ফেললো'-র ঐক্যের মূলে রয়েছে যৌগিক ক্রিয়া গঠনের নিয়ম (১১)।

১১। ক্রিয়া=ক্রিয়া+ক্রিয়া

(১১)-র নির্দেশে সঞ্জাত 'গাছ' হলো (১২)। 'গাছ'-এর শিকড় বা মূল ওপরের দিকে এবং ডালপালা নীচের দিকে, এটা একটু মজার। রেখাগুলোকে বলে 'ডাল'। একাধিক রেখা যে বিন্দুতে মেলে তার ইংরেজী নাম নোড, বাঙলায় 'মোড়' বলাই বোধহয় ভালো। গাছের একেকটা মোড়ের এক এক রকমের নাম থাকে, সেই নামগুলোকেও মোড় বলে ; যেমন (১২)-র মূলবর্তী মোড় 'ক্রিয়া'।

১২।



গাছ না-এঁকে আরেক রকমের বিন্যাস-প্রতিকৃতি আঁকা যায়, তাকে

বলে লেবেল্‌ড্‌ ব্র্যাকেটিং ('বন্ধনীকৃতি' ?)—ছাপতে জায়গা জোড়ে কম, পড়তে মেহনত লাগে বেশি—যেমন (১৩)।

১৩। ((লিখে) (ফেললো))
ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া

গোড়ার কথা বলতে গিয়ে বাঙলা ব্যাকরণের বেশ কয়েকটা খুঁটিনাটির বৃত্তান্ত এসে গেছে। যা বলেছি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে কয়েকটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। যে বাক্যগুলো নিয়ে কথা বলেছি সেগুলোকে অন্বয়ের নিয়মাবলী 'সঞ্জনন' করে (ধ'রে নিন : রান্না করে)। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ভাষীর মাথার ভিতরে ব'সে একটা যন্ত্র অবিশ্রান্ত ওইভাবে বাক্য বানাচ্ছে। ভাষার বক্তা বা শ্রোতা বা লেখক বা পাঠকের মাথার ভিতর কী চলছে সে ভাবনা মানসিক আর সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানীদের। তারা এখনো খুব একটা বুঝে উঠতে পারেননি কী ঘটছে না ঘটছে। ভাষাবিজ্ঞানে আমরা মোটামুটি উপমা দিয়েই খালাস। আমরা কল্পনা করি যেন একটা অদৃশ্য, বিমূর্ত যন্ত্র বাঙলার সমস্ত বাক্য 'সঞ্জনন' করছে, এবং যা বাঙলা বাক্য হতে গিয়ে হলো না [যেমন (১০)] সেইসব প্রায়-বাক্য-স্থানীয় পদসমুচ্চয় 'সঞ্জনন' করতে গিয়েও করছে না। কথাটা অশিথিল ভঙ্গিতে বলা চলে : বাঙলার ব্যাকরণ এক কাল্পনিক যন্ত্র যা সব বাঙলা বাক্য সঞ্জনন করে এবং খালি বাঙলা বাক্যই সঞ্জনন করে—এই কাল্পনিক যন্ত্রের রূপ নির্ধারণ করাই বাঙলার ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ। 'সঞ্জনন' করা বলতে কি বোঝায় ? বলছি।

ব্যাকরণযন্ত্রের অনেকগুলো যন্ত্রাংশ বা 'প্রকরণ' রয়েছে। এগুলোকে একত্রে ধ'রে রাখে 'অভিধান' আর 'অন্বয়'। অন্বয় গাছগুলো বানিয়ে দেয় —প্রথমে গঠন করে তারপর দরকার মতো রদবদল বা পুনর্গঠন ক'রে নেয়। গাছগুলোর খোলা ডালে শব্দের 'ফুল' বা 'পাতা' পরিয়ে দেয় অভিধান, তাকে বলে শব্দনিবেশ। অন্বয়-নির্মিত আর অভিধান-বিচিত্রিত গাছ নিয়ে এক দিকে ধ্বনিপ্রকরণ উদ্‌ঘাটন করে বাক্যটার উচ্চারণ, অন্যদিকে তাৎপর্য-প্রকরণ বাক্যটার অর্থ খানিকটা স্পষ্ট ক'রে দেয় (অর্থের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটন ব্যাকরণের কাজ নয়—প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা হ য ব র ল-য়ের হস্তক্ষেপ

লাগে ওকাজে)। অর্থাৎ মোটের উপর প্রত্যেকটা বাঙলা বাক্যের জন্যে ব্যাকরণযন্ত্র চারটে ক'রে বিন্যাস তৈরি করে—অন্বয়ের বহির্বিন্যাস আর অন্তর্বিন্যাস, উচ্চারণের ধ্বনিবিন্যাস, তাৎপর্যপ্রকরণের তাৎপর্যবিন্যাস। যেসব জিনিসের চারটের বদলে তিনটে বা দুটো বা একটা ক'রে বিন্যাস বেরোয় সেগুলো বাঙলা বাক্য নয়; ব্যাকরণ সেগুলো সঞ্জনন করে না। যেমন ধরুন (১০)।

১০। সুমিত তক্ষুনি কথাটা লিখে ফেললো, একটু বাদে রমেশও ফেললো।

আগেই বলেছি, (১০) সম্বন্ধে বাঙলা অন্বয়ের আপত্তি আছে। কাজেই (১০)এর জন্যে ভোট চাওয়া হলে অন্বয় বলবে, (১০)-এর অন্তর্বিন্যাস আছে বটে, (৯) কিন্তু বহির্বিন্যাস নেই। কিন্তু এক বার যদি অন্বয়কে, জোচ্চুরি ক'রে, (১৯)-এর ভুয়ো বহির্বিন্যাসের গাছ বানিয়ে দিতে রাজী করানো যায়, তাহলে ধ্বনিবিন্যাস বা তাৎপর্যবিন্যাস পেতে কোনো অসুবিধে হবে না। অন্যভাবে বলতে পারি, (১০)-এর দোষ এ নয় যে (১০) উচ্চারণ করতে পেলে বাঙলা উচ্চারণের নিয়ম ভাঙতে হয় (যেরকম হতো বাঙলা বাক্য-গাছের ডালে 'পস্‌তুশ্চ' শব্দনিবেশ করলে), এত নয় যে (১০)-এর মানে হয় না (যে রকম হতো যদি বলতাম 'বাদে একটু তক্ষুনি রমেশই যেন'); দোষ এই যে (১০) অন্বয়ের নিয়ম ভেঙেছে, যেখানে যা উহ্য রাখার হয় সেখানে তা উহ্য রেখেছে। ফলে অন্বয়ের বহির্বিন্যাস-দপ্তর ('পুনর্গঠন-প্রকরণ') (১০)-কে 'সঞ্জনন করে না', বেআইনী ব'লে গণ্য করে, যদিও অন্তর্বিন্যাস-দপ্তর ('গঠন-প্রকরণ'), ধ্বনিপ্রকরণ আর তাৎপর্যপ্রকরণ (১০)-কে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়, 'সঞ্জনন করে'; গোটা ব্যাকরণ যখন একমত হয়ে 'সঞ্জনন করছে' না তখন বলতেই হবে যে বাঙলা ব্যাকরণ (১০)-কে সঞ্জনন করতে পুরো রাজী নয়, (১০) বাঙলা বাক্য হতে হতে হলো না।

এ পর্যন্ত যে-কটা বাক্যের কথা হয়েছে তার সবগুলোর সঞ্জননের যাবতীয় খবর—যা জানি সেটুকুও—দিতে বসলে আসল কথা বলার জায়গা থাকবে না। (১) আর (১৪)-র কথা বলি। এ দুটো বাক্যের আরম্ভ অন্বয়ের গঠন-প্রকরণে; (১)-এর জন্য দায়ী (১৫), (১৪)-র জন্য (১৬)।

১। অজিত দিল্লীতে ((থাকতে) (চাইবে না))

১৪। স্থমিত কথাটা ((লিখে) (ফেললো))

১৫। ক। বাক্য=বিশেষ্য ক্রিয়াপদবন্ধ ক্রিয়া

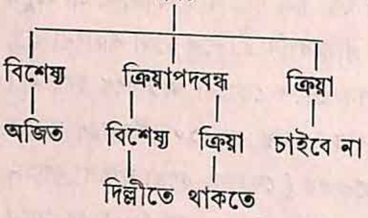
খ। ক্রিয়াপদবন্ধ=বিশেষ্য ক্রিয়া

১৬। ক। বাক্য=বিশেষ্য বিশেষ্য ক্রিয়া

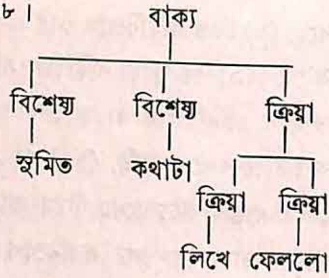
খ। ক্রিয়া=ক্রিয়া ক্রিয়া

নিয়মগুলো (১) আর (১৪)-র জন্যে যে অন্তর্বিন্যাস বানিয়ে দেয় তার গাছ যথাক্রমে (১৭) আর (১৮)। তারপর অন্বয়ের অন্য দপ্তরে কাজ—পুনর্গঠনের নিয়মদের পালা। অসমাপিকা পুনর্গঠন এসে (১৭)-কে ক'রে দেয় (১৯)। (১৯) তাই (১৭)-র বহির্বিন্যাস।

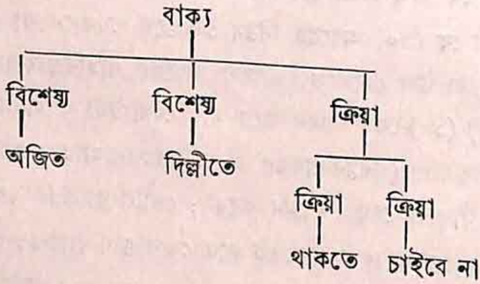
১৭।



১৮।



১৯।



(১৮) নিজেই নিজের বহির্বিন্যাস। পুনর্গঠনের ডাক পড়ে না তার বেলায়। মানে আর উচ্চারণের কথা এখানে না-ই বললাম খুঁটিয়ে। চমস্কির প্রবর্তনায় ভাষাবিজ্ঞানে তত্ত্বরচনার যে নতুন শিল্প এসেছে তার দৃষ্টান্ত দেওয়াই এ লেখার কাজ। ভণিতা তো হলো, এবার আসল কথা পাড়ি।

তিন

বাঙলায় চার রকম বাক্যের (অঙ্গবাক্যকেও বাক্য বলছি) গতিপ্রকৃতি বুঝে দেখতে চেষ্টা করবো। চেষ্টাটার আদল চমস্কির ষোলআনা অনুগত নয় বটে। কিন্তু এ থেকে ওঁর অনুসন্ধানপদ্ধতির মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।

যে চার রকম বাক্য নিয়ে ব্যাপৃত হচ্ছি বাঙলায় তাদের আলাদা আলাদা সর্বজনস্বীকৃত নাম নেই। কাজেই নবরচিত নামের ফর্দ দিয়ে শুরু না ক'রে বরঞ্চ দৃষ্টান্ত দিই গোড়াতেই। বন্ধনীকৃত অংশগুলোই আলোচ্য।

২০। ক। (যারা শিবপূজো করে) তারা অনেকেই তমোগুণের সদর্থক দিকটা জানে।
খ। (যে ভদ্রলোককে দেখলেই বড়বাবুর মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়) তিনি আসেননি বেশ কিছুদিন
গ। (তোরা যখন বড় হবি) তখনও লোডশেডিং থাকবে

২১। ক। (কারা শিবপূজো করে ?)
খ। (কোন ভদ্রলোককে দেখলেই বড়বাবুর মুখ হাঁড়ি হয়ে যায় ?)
গ। (তোরা কবে বড় হবি ?)

২২। ক। (সৌরভ যে পূজোআর্চা করে) সেকথা অনেকে জানে না
খ। (তপেনকে দেখলেই যে নবেন্দুর মুখ হাঁড়ি হয়) সেজন্যে বিমল দায়ী
গ। লাবুও যে ছোটো ছিলো মিতুলের তা মনে থাকতে চায় না

২৩। ক। (সৌরভ পূজোআর্চা করে কি ?)
খ। (তপেনকে দেখলেই কি নবেন্দুর মুখ হাঁড়ি হয় ?)
গ। (লাবুও ছোটো ছিলো কি ?)

এবার নামের পালা। (২০)-রগুলোকে বলতে পারি সম্বন্ধী বাক্য (এ প্রস্তাবটা পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক অশোক

কেলকর-এর)। (২১) আর (২৩)-এর অভিন্ন নাম তো চালুই আছে, প্রশ্ন। দুরকম প্রশ্নের তফাৎ বোঝাতে চাইলে বলা চলে (২১)-এরগুলো অংশপ্রশ্ন, কারণ বাক্যের বিশেষ অংশ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে—কারা, কোন ভদ্রলোককে, কবে—আর ওদিকে (২৩)-এরগুলো সর্বাংশপ্রশ্ন, কেননা ওখানে গোটা বাক্যটাই জিজ্ঞাসার বিষয়। অংশবিশেষ নয়। বাকী থাকছে (২২)। প্রশ্নের নামকরণের নকলে (২০)-র বেলায় 'সম্বন্ধী' না ব'লে যদি বলি 'অংশসম্বন্ধী' বাক্য, (২২)-এ তাহলে বলতে পারবো সর্বাংশসম্বন্ধী বাক্য। (২০)-তে দেখি অংশসম্বন্ধী বাক্যের অংশবিশেষের (যারা, যে ভদ্রলোককে, যখন) সঙ্গে বন্ধনীবহির্ভূত একটা কিছু (তারা, তিনি, তখনো) বিশেষ সম্বন্ধ পাতিয়ে নিচ্ছে। (২২)-এ দেখি বন্ধনীভুক্ত গোটা বাক্যটাই বাইরের পদটার (সেকথা, সেজন্যে, তা) সঙ্গে ওই একই সম্বন্ধে যুক্ত। এই সম্বন্ধটাকে বলতে পারি সমাঙ্কতা ; সমাঙ্কতা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা পরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এসব বাক্যের অন্বয় নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু সে বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ বোধ করা কঠিন। যা সত্যিই ঔৎসুক্যজনক তা হলো বাক্যগুলোর তাৎপর্যবিন্যাস। সম্বন্ধী বাক্যের বেলায় এটা খুবই স্পষ্ট। সর্বাংশসম্বন্ধ থাকলে পুরো বাক্যটাই বাক্যের বহির্ভূত 'প্রতিষঙ্গী' [(ক) সেকথা, (খ) সেজন্যে, (গ) তা] পদের সম্বন্ধী। অংশসম্বন্ধ থাকলে প্রতিষঙ্গী [(ক) তারা, (খ) তিনি, (গ) তখনো] পদের সঙ্গে বাক্যের অংশ বিশেষই সম্বন্ধী, এই অংশকে বলবো সম্বন্ধী অংশ : যারা, যে ভদ্রলোককে, যখন। বাক্যগুলো সাজিয়ে দেখলেই এটুকু মাথায় আসে। সেইসঙ্গে এও মনে হতে পারে যে, তাৎপর্যপ্রকরণের যে নিয়ম এভাবে সম্বন্ধী অংশকে বা সর্বাংশসম্বন্ধী বাক্যকে প্রতিষঙ্গী পদের বশংবদ করলো সেই একই নিয়ম বুঝি প্রশ্নদের বেলাতেও প্রযোজ্য, তফাত খালি এই যে, প্রশ্নদের বাইরে তো কোনো প্রতিষঙ্গী হাজির নেই, কাজেই ওদের বেলায় সম্বন্ধটা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়—

—যতক্ষণ না প্রশ্নের উত্তর আসে। অর্থাৎ প্রশ্নের ভিতরে একটা অসম্পূর্ণ সম্বন্ধকে পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা পোরা থাকে ব'লেই প্রশ্ন প্রশ্ন।

সম্বন্ধী বাক্যের সঙ্গে প্রশ্নের এরকম সাদৃশ্য দাবী করা নিশ্চয়ই চমস্কির ভাষাবিজ্ঞানরীতির বাইরেও সম্ভব ছিলো। কিন্তু একমাত্র চমস্কির

প্রবর্তিত তত্ত্বরচনার ঐতিহ্যেই এ ধরনের কল্পনা পুরোপুরি ডানা মেলে সঞ্চরণ করতে পারে, সেই রকম ব্যাপক তাৎপর্য পায় যে রকম তাৎপর্য অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানের বেলাতেও দেখতে পাই। এই বিশেষ ব্যাপ্তি আসে কোথকে? যুক্তিতে গাঁথা বিস্তীর্ণ জালের একটা গুণ হলো, জালের এক অংশে যদি আপনার কল্পনাপ্রসূত কোনো স্বর বাজিয়ে দেখেন, শীগগিরই সেই স্বর জালের পূর্বনির্মিত স্থাপত্যের আরো নানা জায়গায় চট ক'রে পোঁছে যাবে, অনুরণিত হতে থাকবে আপনার অকল্পিত নানা নতুন ধ্বনিতে। আরেকটু গদ্য ক'রে বলতে পারি, আপনি ভাবলেন একটা ছোটো কথা, সে কথাটা ভ'রে দিলেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এক জায়গায়, এ দিকে আগে থেকে ওই তত্ত্বে জমিয়ে রাখা আরো অনেক কথার সঙ্গে আপনার আনা নতুন কথাটা জুড়ে দ্রুত বেশ কয়েকটা অনুসৃতি (এণ্টেল-মেণ্ট) বেরোলো আপনার প্রস্তাবের। এবার আপনি যাচাই ক'রে দেখতে পারেন আপনার প্রস্তাব ধোপে টিকবে এমন সম্ভাবনা আছে কি নেই। যদি দেখেন অনুসৃতিগুলো বাস্তবের সঙ্গে মিলছে তো চমৎকার--আপনি হয়ত পুরোনো তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। আপনার তাত্ত্বিক প্রস্তাব যে তার একান্ত নিজের গুণে পরীক্ষিত হবে না, আপনার প্রস্তাবের দোষগুণ নির্ণীত হবে--এ খেয়াল থাকলে আপনি শীগগিরই প্রস্তাব আর তার অনুসৃতির সম্পর্কটা কেবল শুকনো নৈয়ায়িক ভঙ্গিতে অঙ্ক কষে বুঝবার বদলে সোজাসুজি স্বর আর প্রতিস্বরের বা বর্ণ-প্রতিবর্ণের ইন্দ্রিয়বেদ্য সম্পর্কের মতো ক'রে চিনতে শিখবেন, এবং আপনার বৈজ্ঞানিক কল্পনাও আপনার এই বিশেষ ইন্দ্রিয়সংবেদনের সঙ্গে সাজশ ক'রে জঙ্গম সৃষ্টি শুরু করবে, এটাই স্বাভাবিক। ভাষাবিজ্ঞানীদের এভাবেই কপাল খুলে গেছে। চমস্কি তাদের একটি তত্ত্বজাল উপহার দিয়েছেন যার এক জায়গায় নতুন উপাদান হানা দিলে সারা তত্ত্বের গায়ে তার পরিস্ফুট সাড়া জাগে।

কী ধরনের অনুরণনের কথা বলছি সেটা প্রশ্ন আর সম্বন্ধী বাক্যের বেলায় দেখাতে পারি।

আমি একটা নতুন কথা বলতে চাই। বলতে চাই প্রশ্ন এমন সম্বন্ধী বাক্য যার প্রতিষঙ্গী শূন্য। কথাটা এমনিতে সত্যি না ভুল তার তো বিচার সম্ভব নয়। 'বিশ্বাস্য' ঠিকই, আমরা জানি যে প্রশ্নের একটা বিশেষ ধরনের অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু ওরকম ভাসা ভাসা জানা দিয়ে কিছু

প্রতিপাদন করা যায় না। তার বদলে জিগেস করি : ঠিক আছে ধ'রে নাও যে যা তুমি বলছো তাই ঠিক। এ থেকে কী অনুসৃতি বেরোয়, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য কথার সঙ্গে মিলিয়ে ?

অনেকগুলো অনুসৃতি, প্রায় সব-কটাই প্রশ্নের সঙ্গে সম্বন্ধী বাক্যের সাদৃশ্যকে ঘিরে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

বাইরের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ্য অন্যরকম (অসম্পৃক্ত) বিশেষ্যের সঙ্গে সংযোজক-অব্যয়-ওয়ালা জোট বাঁধতে পারে না, এরকম একটা কথা ভাষা-বিজ্ঞানীরা তত্ত্বজালে মজুদ রেখেছেন অনেক দিন। কথাটার প্রচলিত নাম 'যোজক-বাধা'। এই বাধা যে অংশসম্বন্ধী বাক্যের সম্বন্ধী অংশরা মানবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ সম্বন্ধী অংশ বাক্যবহির্ভূত প্রতিষঙ্গীর সঙ্গে যোগসাজশে লিপ্ত।

২৪। (সুমিত, তপেন, যে আর নবেন্দু সাঁতার কাটতো) সে বাসা পালটেছে।

বাঙলায় (২৪) বলা যায় না। বলা গেলে এর মানে হতো—ওই তিন-জনের সঙ্গে যে সাঁতার কাটতো সে বাসা পালটেছে। কিন্তু আমার কথাটা থেকে অনুসৃত হয় যে (২৫)-ও বলা চলবে না, কারণ বন্ধনীর বাইরের শূন্য প্রতিষঙ্গী (২৫)-এর 'কে'-কে সমাঙ্কতা-সম্বন্ধে ধ'রে রেখেছে।

২৫। (সুমিত, তপেন, কে আর নবেন্দু সাঁতার কাটতো) ০ ?

ঠিকই ধরেছি ; (২৫) সত্যিই যায় না বলা। আমার প্রস্তাবটা তাহলে যোজক-বাধার পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। প্রশ্ন সম্বন্ধী বাক্যের অনুরূপ—এই দাবী তাহলে খালি বিশ্বাসই নয়, খানিকটা সমর্থনও পেলো। এই ধরনের সমর্থন পাওয়াকে একটু আগে বলছিলাম সুরের প্রতিসুর।

প্রথম দফাতেই প্রস্তাবটা খারিজ হয়ে গেলো না তাহলে। এবার পাকাপাকি পরিস্ফুট ক'রে প্রস্তাব উপস্থাপন।

প্রস্তাবটা যেভাবে পেশ করছিলাম তার একটা কাঁচা দিক হলো, ধ'রে নিচ্ছিলাম সম্বন্ধী অংশের সঙ্গে প্রতিষঙ্গীর যোগটা সবসময়ই সরাসরি ঘটে,

যেন তাৎপর্যপ্রকরণের সমাঙ্কতা-স্থাপক নিয়মের নির্দেশে সম্বন্ধী অংশ হাত বাড়িয়ে প্রতিযঙ্গীর সঙ্গে হাত মেলায় : **'যারা** শিবপূজো করে **তারা**··· ।' দুঃখের বিষয় 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়' ; প্রায়ই মধ্যস্থের ডাক পড়ে। মধ্যস্থকে শনাক্ত করার প্রস্তুতিকল্পে (২২)-এর দিকে নজর দিন। ভেবে দেখুন ওই 'যে'-শব্দটার চরিত্র কী। ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্যতম প্রিয় প্রশ্ন : 'ওর বদলে কী বসতে পারতো ?' একটা উত্তর—'কি' :

২৬। ক। সৌরভ কি পূজোআর্চা করে ?
খ। তপেনকে দেখলেই কি নবেন্দুর মুখ হাঁড়ি হয় ?
গ। লাবুও কি ছোটো ছিল ?

আরেকটা উত্তর হলো 'তো' :

২৭। ক। সৌরভ তো পূজোআর্চা করে
খ। তপেনকে দেখলেই তো নবেন্দুর মুখ হাঁড়ি হয়
গ। লাবুও তো ছোটো ছিলো

এতে খানিকটা উত্তর পাওয়া গেল জিজ্ঞাসার : (২২)-এর 'যে' যাই হোক না কেন, (২৬)-এর 'কি' আর (২৭)-এর 'তো'-ও তাই। এবার ভাষা-বিজ্ঞানীর প্রিয় আরেকটা প্রশ্ন শুনুন : 'ওরা নির্বিবাদে পাশাপাশি থাকতে পারে কি' ? পারে না :

২৮। ক। সৌরভ কি তো পূজোআর্চা করে ?
খ। তপেনকে দেখলেই যে কি নবেন্দুর মুখ হাঁড়ি হয়···
গ। লাবুও তো যে ছোটো ছিলো

(২৮)-এর পদসমুচ্চয়গুলো সার্থক বাক্য নয়। অতএব ধ'রে নেওয়া দরকার যে প্রত্যেক বাক্যে একটা ক'রে জায়গা থাকে 'যে' অথবা 'তো' অথবা 'কি' অথবা সমগোত্রীয় অন্য কিছু (কিন্তু মাত্র একটাই) বসতে পারে। বাক্যের এই নির্দিষ্ট জায়গাটাকে বলা যাক 'বাক্য-নোঙর'-এর জায়গা ; যে / তো / কি তাহলে 'বাক্য-নোঙর' (একটা বাক্যের ভিতরে যদি একাধিক বাক্য

থাকে, লোকে যাদের উপবাক্য বলে, তাহলে স্পষ্টতই একাধিক নোঙরের স্থান হবে : 'লাবুও যে ছোটো ছিলো মিতুলের তা যে মনেই থাকে না সেকথা শুনে বীরেন তো অবাক' ; সে কথা আলাদা)।

এবার লক্ষ করুন, অংশসম্বন্ধী বাক্যে বা অংশপ্রশ্নে নোঙরের স্থান হয় না। নিচের দৃষ্টান্তগুলো বাঙলা বাক্য হতে হতে হয়নি।

২৯। ক। যারা তো শিবপূজো করে তারা অনেকেই তমোগুণের সদর্থক দিকটা জানে

খ। কারা শিবপূজো করে তো ?

বাঙলা ভাষার বিবরণদাতার অনেক দায়িত্বের মধ্যে একটা দায়িত্ব হলো (২৯)-এর রহস্যভেদ : (২৯)-এর দোষটা কী ? 'তো'-র প্রবেশাধিকার নেই কেন ? অন্য কোনো নোঙর তো জায়গা জুড়ে নেই, তবে ?

এরকম রহস্যকে জব্দ করার একটা উপায় হলো প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের উদ্ভাবিত শূন্য যার প্রয়োগ যুগে যুগে চ'লে আসছে। ধ'রে নিতে পারি, 'যারা শিবপূজো করে' বাক্যটাতে নোঙর দেখা না গেলেও আছে নোঙর, শূন্য নোঙর, সেজন্যেই 'তো'-র প্রবেশ নিষেধ ; 'কারা শিবপূজো করে ?'-তেও তথৈবচ।

বেছে বেছে এই ধরনের বাক্যেই কেন নোঙর অদৃশ্য ? এর একটা উত্তর হতে পারে—এখানে আমি আন্দাজ অর্থাৎ কল্পনা করছি, ঠিক কিনা এখনো জানি না—অংশপ্রশ্নে এবং অংশসম্বন্ধী বাক্যে বাক্যনোঙরের সঙ্গে বাক্যের অংশের (জিজ্ঞাসিত ভাগের বা সম্বন্ধী ভাগের) এমন একটা সংযোগ ঘটে যা 'সমাঙ্গতা' নয় (অর্থাৎ অংশের সঙ্গে প্রতিষঙ্গীর যে সংযোগ তার অনুরূপ নয়), যাকে বরং বলতে পারি 'সহযোগ'। ধ'রে নিন যে সহযোগের একটা বিধান এই যে সহযোগী বাক্যনোঙরের বাক্য চেহারা থাকতে নেই।

সহযোগ ব্যাপারটা কী তা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে বেশি।

৩০। রাম গত দশকে যাকে যা বলেছিলো ঙ এখন রাম তা ভুলে যেতে চায় (ঙ=বাক্যনোঙর)

আমরা আগে যেভাবে সমাঙ্কতা পাতাচ্ছিলাম সে পদ্ধতি এখানে অচল। একটা প্রতিষঙ্গীর সঙ্গে মাত্র একটা সম্বন্ধী অংশেরই পরিচায়ক অঙ্ক মিলতে পারে—যে মিলকে বলছি সমাঙ্কতা, যে মিল বোঝানোর জন্যে প্রায়ই আক্ষরিক অর্থে অঙ্কের ব্যবহার হয় (যেমন 'যারা-১ শিবপূজো করে তারা-১ যা-২ ভাবে তা-২ নিয়ে মাথা ঘামিও না')। (৩০)-এ মোটে একখানা প্রতিষঙ্গী মজুদ আছে, 'তা' ; সমাঙ্কনের উমেদার দুজন, 'যাকে' আর 'যা'। সাধারণ বুদ্ধি এবং গণিত একমত যে 'তা'-র পক্ষে যুগপৎ উভয়ের সঙ্গে সমাঙ্কিত হওয়া চলবে না। তাহলে তো বাক্যের কলকব্জা বিগড়ে যাওয়া উচিত ; যাচ্ছে না কেন ? যাচ্ছে না কারণ, প্রথমে 'যাকে' আর 'যা'-র সঙ্গে তাদের বাক্যের নোঙরের সহযোগ-চুক্তি সই হয়ে গেছে ; তারপর 'তা' এসে ওই নোঙরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছে, ফলে 'তা'-র সঙ্গে পরোক্ষ সম্বন্ধ হয়েছে 'যাকে' এবং 'যা'-র।

সহযোগের একটা কাজ তাহলে সহযোগী বাক্যনোঙর মারফত প্রতিষঙ্গীর কাছে একাধিক অংশের আর্জি পৌঁছে দেওয়া। সহযোগের আরেকটা গুণ প্রকাশ পাবে (৩১)-এ।

৩১। ক। রাম কাকে কী বলেছিলো ঙ ০ ?
খ। রাম যাকে যা বলেছিলো ঙ এখন রাম তা ভুলে যেতে চায়
গ। রাম কাকে যা বলেছিলো ঙ এখন রাম তা ভুলে যেতে চায় ০ ?
ঘ। রাম যাকে কী বলেছিলো ঙ সে তখন সবে সেরে উঠছে ০ ?

লক্ষ করুন ক আর খ বলা যায়, গ আর ঘ বলা যায় না [বলা গেলে মানে দাঁড়াতো (গ) 'রাম বিশেষ একজনকে যা বলেছিলো এখন রাম তা ভুলতে চায় ; সেই বিশেষ একজন কে ?' (ঘ) 'রাম যাকে বিশেষ একটা কিছু বলেছিলো সে তখন সবে সেরে উঠেছে ; সেই বিশেষ একটা কিছু কী ?'] এই রহস্যের সুরাহা বাতলে দেয় সহযোগ। সহযোজনের সময় বাক্যনোঙর ঙ-র সঙ্গে তার সহযোগার্থী অংশদের সুর মেলা চাই। ঙ যদি প্রশ্ন-জাতীয় (অর্থাৎ শূন্য প্রতিষঙ্গীর সম্বন্ধার্থী) হয় তাহলে তার সহযোজ্য

অংশদেরও তাই হতে হবে—তাই (৩১ক) বলা যায়। ঙ যদি সম্বন্ধজাতীয় হয় (অর্থাৎ রক্তমাংসের প্রতিষঙ্গীর সমাঙ্কতাকামী) তাহলে তার সহযোজ্য অংশদেরও সম্বন্ধজাতীয় হওয়া চাই। এজন্যেই (৩১খ) বৈধ। কিন্তু গ ঘ-য়ের বেলা বেসুরো। গ-য়ে প্রথম সহযোজ্য অংশ (কাকে) প্রশ্নজাতীয়, দ্বিতীয়টা (যা) সম্বন্ধজাতীয় ; ঘ-য়ে প্রথম অংশ (যাকে) সম্বন্ধজাতীয় ; দ্বিতীয়টা (কী) প্রশ্নজাতীয় ; কাজেই এ বাক্যগুলোতে নোঙর অগত্যা অসহযোগী, বাক্যটা ধ্ব'সে যায়।

শূন্য বাক্যনোঙর আর সহযোগের ব্যাপারটা গোড়ায় খুব একটা বিশ্বাস্য না লাগলেও ওরকম কল্পনা ক'রে নিলে কী কী লাভ হয় দেখে দেখে হয়ত প্রতীতি বাড়বে।

ছবিটা এখন মোটামুটি আদল নিচ্ছে কয়েকটা দিক স্পষ্ট করা দরকার। প্রতিষঙ্গীর সঙ্গে যে কোনো কিছুর সমাঙ্কতাসম্বন্ধ সোজাসুজিও হতে পারে পরোক্ষও হতে পারে। পরোক্ষতা দুদিকে কাটে। (৩০)-এ একটা মোটে প্রতিষঙ্গী সোজাসুজি নোঙরকে কব্জা ক'রে নেওয়ায় পরোক্ষে 'যাকে' আর 'যা' দুটোকেই সমাঙ্কিত করতে পেলো। (৩২)-এ দেখি দুই প্রতিষঙ্গী যে যার সম্বন্ধার্থী অংশের সঙ্গে সোজাসুজি সমাঙ্কতা পাতিয়ে নিচ্ছে, ফলে অদৃশ্য বাক্যনোঙরটাও পরোক্ষ সম্বন্ধে বাঁধা প'ড়ে যাচ্ছে।

৩০। রাম গত দশকে যাকে যা বলেছিলো ঙ এখন রাম তা ভুলে যেতে চায়

৩২। যে যাকে বেশি ভালোবাসে ঙ সে তাকে বোঝে কম

একাধিক যাচক অংশের জন্যে একাধিক যোগ্য প্রতিষঙ্গী হাজির থাকলেই তারা সমাঙ্কনের দায়িত্ব নিতে রাজী হবে এমন কোন কথা নেই :

৩৩। রাম যাকে যা বলেছিলো ঙ এখন সে তা ভুলে যেতে চায়

এখানে ইচ্ছে করলেই 'সে' ঠিক করতে পারে 'যাকে'-র সঙ্গে সমাঙ্কিত হবে, 'তা' করতে পারে 'যা'-এর যাচ্ঞা মঞ্জুর। তাতে একটা মানে পাওয়া যায় বাক্যটার : রাম অমুককে তমুক বলেছিলো, এখন অমুক চায় তমুক

ভুলে যেতে। কিন্তু বাক্যটার আরো একটা মানে হয়। (৩৩)-এর মানে হতে পারে : রাম অমুককে তমুক বলেছিলো, এখন রাম চায় অমুককে তমুক বলার কথা ভুলে যেতে। (৩৩) এভাবে পড়লে বা শুনলে 'যাকে' আর 'যা' দুয়েরই বোঝা চাপে নোঙর মারফত একা 'তা'-র ঘাড়ে, কারণ স্পষ্টতই 'সে' শব্দটা এবার 'যাকে'-র সঙ্গে নয়, 'রাম'-এর সঙ্গে সমাঙ্কিত ; যেসব নিয়মে সম্বন্ধী বাক্যের অংশেরা দোসর খুঁজে নেয় স্পষ্টতই 'রাম' আর 'সে'-র সমাঙ্কন সেসবের আওতায় পড়ে না, সেইজন্যে এরকম সমাঙ্কতাকে বলা চলে 'শিথিল' বা 'ঐচ্ছিক'। শৈথিল্যের ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে যদি (৩৩)-এর আরো একটা মানে লক্ষ করেন (এই তৃতীয় মানেটাতে 'সে' তার বাক্যের অন্তর্গত কোনো পদের সমার্থবহ নয়) : রাম-১ অমুককে-২ তমুক-৩ বলেছিলো, এখন সে-৪ (বাক্যের বাইরে আগে উল্লেখ করা কেউ) ভুলে যেতে চায় যে রাম অমুককে তমুক বলেছিলো। এই তৃতীয় মানেটাতে 'সে' একদম স্বাধীন অর্থ বহন করছে, সুতরাং এটার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝা যায় যে দ্বিতীয় মানেটাতে 'সে' যদি 'রাম'-এর সমাঙ্ক হয়ও সেটা তার নিজের ইচ্ছেয় হয়েছে, না হ'লেও তার চ'লে যেতো ; কোনো অশিথিল সমাঙ্কন-নিয়মের প্রয়োগে 'সে' আর 'রাম'-এর সমাঙ্কতার কারণ নয়। এর প্রতি-তুলনায়, অংশসম্বন্ধী বাক্যের সম্বন্ধী অংশ আর তার প্রতিষঙ্গী যে সমাঙ্কনে যুক্ত হয় তাকে বলে 'অশিথিল' বা 'নিয়মানুগ' সমাঙ্কন। যেমন (৩২)-এর একটাই মানে, সেই মানেটাতে প্রত্যেক প্রতিষঙ্গী একটা ক'রে সম্বন্ধী অংশের সঙ্গে নিয়মাধীন সমাঙ্কনে অঙ্কিত। নানা কারণে (৩২)-এর প্রতিষঙ্গীদের আর কোনো গতি নেই, ওরা শিথিল সমাঙ্কতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এবার (৩১ক)-র মতো প্রশ্নের কথা ভাবুন। পাশাপাশি একাধিক শূন্য কল্পনা ক'রে নিতে পারেন কি ?

৩৪। রাম কাকে কী বলেছিলো ০ ০ ?

এর উপর আরো রঙ চড়িয়ে ভাবতে পারেন কি যে (৩৪)-এর মানের হেরফের ঘটতে পারে ?

৩৫। ক। রাম-১ কাকে-২ কী-৩ বলেছিলো ঙ-২, ৩ ০-২ ০-৩

খ। রাম-১ কাকে-২ কী-৩ বলেছিলো ঙ-২, ৩ ০-১ ০-২, ৩

গ। রাম-১ কাকে-২ কী-৩ বলেছিলো ঙ-২, ৩ ০-৪ ০-২, ৩

আপনি বলবেন কল্পনা করতে পারুন বা না পারুন, (৩৫-এ) প্রদর্শিত তিনরকম মানে যে (৩১ক)-র নেই এটুকু খেয়াল করবার মতো বাঙলা এখনো মনে আছে, আমার শত নৈয়ায়িক অত্যাচারেও ভোলেননি; অতএব কল্পনার দৌড় (৩৫) অব্দি ঠেলতে আপনি রাজী নন, এবার লাগাম দরকার।

ঠিকই বলছেন, (৩৫)-এ প্রদর্শিত বৈচিত্র্যটা আসলে নেই, (৩১ক)-র মানে একটাই, সে মানে (৩৬)।

৩৬। রাম-১ কাকে-২ কী-৩ বলেছিলো ঙ-২, ৩ ০-২, ৩

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখবেন, কল্পনা এখানে নিজে থেকে আপনাকে বিপথে নিয়ে যেতে রাজী হবে না। (৩৪) কল্পনা ক'রে ফেললে (৩৫) অনিবার্য কিনা সে প্রশ্ন মুলতুবী রেখে প্রথমে লক্ষ করুন যে কল্পনার রাজ্যে (৩৪) বৈধ নয়। দু ফোঁটা জল যেভাবে মিশে একাকার হয়ে যায় তেমনি পাশাপাশি দুটো শূন্য থাকলে তারা মিশে পরস্পর লীন হয়। উপমা ভালো না লাগলে গণিতজ্ঞকে জিগেস ক'রে দেখুন সমাহার হিসেবে {০} আর {০, ০}-র মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা। নেই। দেখতেই পাচ্ছেন, গোড়াতেই বাধা ছিলো কল্পনার (৩৪) অবৈধ।

যদি বা ভুল ক'রে (৩৪)-এ পৌঁছে গিয়ে থাকেন, তারপর সেখান থেকে (৩৫)-এ পৌঁছনো খুব একটা সহজ নয়; কল্পনারও তো প্রবণতা অপ্রবণতা আছে। (৩৫ ক)-কে হয়ত ক্ষমা করা যায়, কারণ হাজার হোক এখানে শূন্যরা খালি নিয়মাধীন সমাঙ্কনে সমাঙ্কিত; যে শূন্য নিজেই তাৎপর্যপ্রকরণের নিয়মের সন্তান তার পক্ষে নিয়মাধীন সমাঙ্কলাভ এমন কিছু অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু (৩৫ খ, গ) দুটোতেই প্রথম শূন্য যে অশিথিল সমাঙ্কনের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা ঘটাচ্ছে এটা একদম বেআইনী। যার মাথা নেই তার মাথাব্যথা কীসের? শূন্য তো কোনো সত্যিকারের বিশেষ্য বা সর্বনামের মতো পরিচয়বাহী নয় যে তার সঙ্গে 'রাম'-এর বা আর কারো পরিচয় মিললো কি না মিললো সেটা স্বাধীনভাবে নির্ণীত হতে পারে।

অতএব কোনোক্রমে যদি (৩৪) খালাস পেয়ে যেতোও, (৩৫)-এর খ আর গ তবুও রেহাই পেতো না কল্পনার অন্তর্নিহিত নিষেধের আওতা থেকে। কাজেই কল্পনা, সূক্ষ্মকায় কল্পনা, বিশ্বস্ত সেবকের মতো আপনাকে ঠিক ঠিক ব্যাখ্যাতেই পৌঁছে দিয়েছে, অলীক প্রত্যাশা জাগিয়ে প্রতারিত করেনি। 'রাম যাকে যা বলেছিলো এখন সে তা ভুলে যেতে চায়'-এর তিনটে মানে এবং 'রাম কাকে কী বলেছিলো'-র একটা মোটে মানে—এদিকের প্রাচুর্য আর ওদিকের সংযম দুইই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিস্ফুট কল্পনায় ধরা দেয়।

চার

সম্বন্ধী বাক্য আর প্রশ্ন নিয়ে যে বিশ্লেষণ ফেঁদেছি সেটার দৌড় কতদূর তার চরম উদাহরণ দিয়ে তারপর আলোচনার প্রধান প্রবাহে ফিরে আসবো।

বৈধ বাঙলা বাক্যের তল্লাট থেকে (৩৭) এত দূরে যে (৩৭)-এর মানে কী হতে পারে তা ভেবে বার করতে বেগ পেতে হয়। মানেটা মোটামুটি এইরকম : রামের একজন মক্কেল আছে ; রাম তাকে পরামর্শ দিয়েছিলো ; সে শ্যামের কাজে লেগেছে ; মক্কেলটি যদুর বন্ধু। এরকম চেষ্টা ক'রে মানে বার করতে হয় ব'লে (৩৭)-কে বলবো বিভীষিকা।

৩৭। রাম যে মক্কেলকে যে পরামর্শ দিয়েছিলো সেই পরামর্শ শ্যামের কাজে লেগেছে সেই মক্কেল যদুর বন্ধু

আমাদের দেশে বিভীষিকা নিয়ে এমনকি বৈয়াকরণরাও মাথা ঘামান না। কিন্তু যেসব ভাষার গঠন নিয়ে আধুনিক আদলের কাজকর্ম হয়েছে, যেমন ইংরেজী, সেসব ভাষায় বিভীষিকা নিয়ে কাজ চলছে বছর দশেক হলো। ইংরেজীতে অন্তর্গঠন (৩৮) আর (৪০) থেকে বহির্গঠিত হতে পারে যথাক্রমে (৩৯) এবং (৪১), কিন্তু (৪২) যদি অন্তর্গঠন হয় তাহলে কিছু করবার নেই, বহির্গঠন হিসেবে (৪৩) অচল।

৩৮। The advice-1 Ram gave which-1 to the client has been useful to Shyam

৩৯। The advice-1 which-1 Ram gave to the client has been useful to Shyam

৪০। The client-1 Ram gave advice to whom-2 is a friend of Jadu's

৪১। The client-2 to whom-2 Ram gave advice is a friend of Jadu's

৪২। The client-2 the advice-1 Ram gave which-1 to whom-2 had been useful to Shyam is a friend of Jadu's

৪৩। The client-2 to whom-2 the advice-1 which-1 Ram gave has been useful to Shyam is a friend of Jadu's

এর কারণ কী ? ইংরেজী নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা বলেন যে, যে-যে-নিয়ম ('WH Movement') খাটিয়ে (৩৮) থেকে (৩৯) পাই বা (৪০) থেকে (৪১) পাই সেই পুনর্গঠনের নিয়মটা (৪২)-এ প্রয়োগ করলে তার আশু ফল দাঁড়ায় The client *the advice-1 which-1 Ram gave to whom* has been useful to Shyam is a friend of Jadu's, এবং ওই বাক্যের বাঁকা হরফে ছাপা অংশটা এমন এক বিশেষ ধরনের পদবন্ধ (জটিল নামপদবন্ধ) যার ভিতরের সঙ্গে বাইরের সংযোগ বা যাতায়াত নিষেধ ; সুতরাং দ্বিতীয়বার WH-প্রয়াণ প্রয়োগ ক'রে to whom টেনে বার করা অসম্ভব। ইংরেজীতে এটা বলা কঠিন নয়, কারণ ইংরেজী সম্বন্ধী বাক্যে WH-প্রয়াণ না ঘটলেই নয়, এবং সেটা কোনো কারণে আটকে গেলে গোটা বাক্যটাই ধ্ব'সে যায়। কিন্তু বাঙলার বেলা বাঙলায় সম্বন্ধার্থী অংশ তো ঘুরে ফিরে বেড়ায় না, বা অন্তত ঘুরতে ফিরতে বাধ্য নয়। তবু যে (৩৭) অচল এর ব্যাখ্যা কী ?

নোঙর ফেলে দেখা যাক।

৪৪। (বাক্য-অ (বাক্য-অ রাম যে মক্কেলকে যে পরামর্শ দিয়েছিলো ৬-আ) সেই পরামর্শ শ্যামের কাজে লেগেছে ৬-অ) সেই মক্কেল যদুর বন্ধু

নোঙরগুলোর পায়ে ইচ্ছে ক'রে সংখ্যার বদলে হরফ পরিয়ে দিয়েছি, এতে আশা করি পাঠকের মনে পড়েছে যে সম্বন্ধার্থী অংশদের সঙ্গে নোঙরের সহযোগ পাতানো দরকার, বিনা সহযোগে সমাঙ্কতাসাধন বে-আইনী। (৪৪)-এর চেহারা দেখে নিশ্চয় আঁচ করতে পেরেছেন (৩৭)-এ গোলমালটা কীসের। 'যে মক্কেলকে' আর 'যে পরামর্শ'-কে মন ঠিক ক'রে বলতে হবে তারা কোন নোঙরের দলে—অ না আ। যেটাই ঠিক করুক ট্র্যাফিক জ্যাম অবধারিত। যদি ঠিক করে ঙ-আ, তাহলে 'পরামর্শ'-র সমাঙ্কন :

((রাম যে মক্কেলকে-২ যে পরামর্শ-১ দিয়েছিলো
৪৫। অ আ
ঙ-১,২) সেই পরামর্শ-১ শ্যামের কাজে লেগেছে ঙ-অ) সেই মক্কেল যদুর বন্ধু

কিন্তু তাহলে 'যে মক্কেল' থেকে 'সেই মক্কেল' বিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। যদি সাব্যস্ত হয় ঙ-অ, তাহলে উলটো মুশকিল।

((রাম যে মক্কেলকে-২ যে পরামর্শ-১ দিয়েছিলো ঙ-আ)
৪৬। অ আ
সেই পরামর্শ শ্যামের কাজে লেগেছে ঙ-১, ২) সেই মক্কেল-২ যদুর বন্ধু

এই উভয়সঙ্কট থেকে নিস্তার নেই। (৩৭)-এর বরাতে কিস্তিমাৎ।

প্রশ্নের বেলাতেও একই কথা। জাঁহা (৩৭) তাঁহা (৪৭)। (৪৭) বৈধ বাক্য হ'লে তার মানে দাঁড়াতো 'রামের একজন মক্কেল আছে ; শ্যাম জানে রাম সেই মক্কেলকে কী পরামর্শ দিয়েছিলো ; কে সেই মক্কেল ?' কিন্তু (৪৭) বেআইনী। (৩৭)-এর অবৈধতার যা ব্যাখ্যা এখানেও তাই।

(শ্যাম জানে (রাম কোন মক্কেলকে-২ কী পরামর্শ-১
৪৭। অ আ
দিয়েছিলো ঙ-আ) ০-১ ঙ-অ) ০-২

পাঁচ

আশা করি ভাষার যেসব এলাকায় আলো পড়ছিলো সেগুলোর দিকে যেটুকু মন দিচ্ছিলেন ততটাই বা তার চেয়ে বেশী মন দিয়ে দেখছিলেন আলোটা কী ধরনের এবং ফেলা হচ্ছে কীভাবে। তথ্য থেকে ছেঁকে তত্ত্ব নিষ্কর্ষণ করছিলাম না। তত্ত্বরচনার প্রথম ধাপে বাস্তবের ধার ধারছিলাম না বিশেষ। নিজের মনগড়া মূর্তি এনে বাস্তবের দ্বারস্থ হচ্ছিলাম ওই মূর্তির কোনো প্রযোজ্যতা আছে কিনা জানবার জন্যে। এভাবে দ্বারস্থ হ'লে বঞ্চনার আশঙ্কা আছে যথেষ্ট এখানে পরিসর কম, পাঠকসাধারণ বঞ্চনার বদলে সাফল্যেরই দৃষ্টান্ত দেখতে ভালোবাসেন, তাই সে ধরনের দৃষ্টান্তই দিয়েছি। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায়, মনগড়া মূর্তির সঙ্গে বাস্তব ঠিক মিললো না। বৈজ্ঞানিকের কাজ হলো এতে না দ'মে আবার মূর্তি গড়ে আনা, অন্য দিকে বা অন্য ভঙ্গিতে কল্পনা খেলিয়ে। হতেই পারে যে এখানে তত্ত্ববুনোট বুনেছি সেটা কালকেই ফালি ফালি হয়ে ছিঁড়ে যাবে হঠাৎ চোখে প'ড়ে যাওয়া তথ্যের আঘাতে। সম্বন্ধী বাক্যের বা প্রশ্নের শূন্য নোঙর আছে এ বিশ্বাস হয়তো স্বল্পায়ু হবে। কিন্তু যতদিন এর আয়ু ততদিন ভাষাবিজ্ঞানীরা শূন্য-নোঙর-কল্পনার নান্দনিক পারিপাট্যের জন্যেও বাঙলা বাক্যের এই ছবিটাকে মূল্য দেবেন, নিছক তথ্যসংগতির জন্যে যায়।

এতে ক'রে যেন ভাষাবিজ্ঞান উপন্যাসধর্মী ইতিহাসের কাছাকাছি চ'লে এলো। সাবেক যুগের ঐতিহাসিকদের রচনার অনেক খুঁটিনাটির গলদ পরবর্তী গবেষণায় সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু এখনো তাঁদের কল্পনার গ্রন্থন অনুভব করবার জন্যে লোকে সেসব বই প'ড়ে। চমস্কি-প্রবর্তিত কল্পনা-প্রধান ভাষাবিজ্ঞানের রচনাবলীতে ভবিষ্যৎকালের বিজ্ঞানীরা এই রকম নান্দনিক কিছু খুঁজে পাবেন মনে হয়।

পাঠককে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার যে, বর্তমান লেখার বেশির ভাগ সরঞ্জাম চমস্কির বা তাঁর সহপণ্ডিতদের প্রবর্তিত বা পরিশোধিত হ'লেও, যেসব মতামত এখানে ব্যক্ত হয়েছে তা চমস্কির কোনো কোনো বক্তব্যের পরিপন্থী। সে বক্তব্যগুলো ওঁর কাজের কেন্দ্রীয় অংশ নয়, কাজেই এ লেখাটা চমস্কি-প্রবর্তিক কল্পনারীতির নমুনা ঠিকই ; কিন্তু সম্বন্ধী বাক্য আর প্রশ্নের এই ছবির অনুপুঙ্খের জন্য চমস্কিকে দায়ী ভাবা ভুল।

বিজ্ঞান, সত্যি কথা, আর শত পুষ্প

বিজ্ঞান কী, এ জিজ্ঞাসার ইতিবৃত্ত এত দীর্ঘ আর কণ্টকিত যে কে কবে কী বলে গেছে তার হিসেব রেখে রেখে এগোনো খুব একটা লাভজনক নয়। আক্ষরিক অর্থে ইতিহাস না ঘেঁটে বরং ভাবনার বাঁকগুলো ধরতে চেষ্টা করি। যাকে বাঁক বলছি, মার্কস আর হেগেলের কথার ধরনে তার প্রতিশব্দ মোমেণ্ট। তাতে ক্ষণ বা সন্ধিক্ষণের অর্থ ই প্রধানত আসে, কিন্তু পরিবর্তনের ভরবেগ বা মোমেণ্টামের অনুষঙ্গটাও ছুঁয়ে যায় যেন। ঠিক অতটা সূক্ষ্ম ধারণার ব্যবহার দ্বান্দ্বিক চিন্তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নাও হতে পারে। তাই বলছি বাঁক।

আরোহবাদ

সহজ বুদ্ধিতে বলে, এবং বিজ্ঞান নিয়ে প্রথম দিকের আলোচনাতে পাইও কথাটা—বিজ্ঞানীর কাজ হলো বস্তু (সজীব হোক জড় হোক) আর ঘটনা লক্ষ করা, পাইকিরি হারে। পরিলক্ষিত খবর সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয় বিজ্ঞানের বইয়ে আর বিজ্ঞানীর মাথায়। এই সাজগোছ করতে গিয়ে অসংখ্য অনুরূপ ঘটনার বা বস্তুর সাম্য স্পষ্ট হয়। সেই স্পষ্টতা একেকটা ধারণার বা সূত্রের চেহারা নেয় : বৃহত্তর বানরজাতির মতো ধারণা, অভি-কর্ষের মতো সূত্র। যত যুগ কাটে তত বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় জমানো খবর বাড়তে থাকে। ফলে উত্তরোত্তর ব্যাপক ধারণা আর সূত্র অভ্যুদিত হয়। বিজ্ঞান এগোয় এইভাবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির নাম আরোহবাদ। সুসজ্জিত তথ্যের মই বেয়ে অর্থাৎ আরোহণ করে ও তত্ত্বে পৌঁছোনোর ছবি, তাই এমন নাম। লক্ষ করা ভালো যে আরোহী ধরনে মানবিক চিন্তারও শ্রেয়োনৈতিক বাঁক আছে। মানুষ নাকি ক্রমশ ক্ষুদ্র গণ্ডীর স্বার্থ পেরিয়ে বৃহৎ স্বার্থকে চিনতে শেখে, এবং যতই শেখে ততই ব্যক্তিত্ব শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে ওঠে। এ ভাবনাটা বিজ্ঞানবিষয়ক আরোহবাদের আত্মীয়।

উপকল্পবাদ

আরোহবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল উপকল্পবাদ। উপকল্প বা হাইপথিসিস একরকম আন্দাজ যার পিছনে কল্পনা পরিশ্রম দুইই আছে। আন্দাজটা ঠিক কোথা থেকে এল সে প্রশ্ন অবান্তর, বৈজ্ঞানিক মহল (আন্দাজ যে করেছে সেও) সর্ব শক্তি দিয়ে তাকে আক্রমণ করার পর সে টিকতে পারল কিনা এটাই আসল—এই কথার উপর জোর দেওয়ার জন্য আন্দাজকে উপকল্প বলা চলে। আন্দাজকে অনুমান বা অনুমিতি বললে তার মানে তো ইন-ফারেন্স বা ডিডাকশন, অর্থাৎ কয়েকটা জানা কথা মিলিয়ে ভেবে বার করা সিদ্ধান্ত যার নির্ভরযোগ্যতা ওই জানা কথাগুলোর নির্ভরযোগ্যতার সমান। উপকল্প কোনো যুক্তিগাঁথুনির শেষ নয়, বৈজ্ঞানিক যাচাইপ্রক্রিয়ার শুরু। আন্দাজকে যে অনুমিতি হিসেবে অথবা উপকল্প হিসেবে দেখা যায় এটা এক বাস্তব দ্বৈধ যার প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পাব পরের বাঁকে। তার আগে এই বাঁকের কাজটা সেরে নিই।

উপকল্পবাদের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের ভুল ধরা যায় কিন্তু 'ঠিক ধরা' যায় না। অল্প একটু বিরুদ্ধ সাক্ষ্য পেলেই সিদ্ধান্ত ভেস্তে যায়। এবং কোনোদিন সেরকম সাক্ষ্য আসতে পারে এমন ভয় থাকে বলে কখনো কোনো কথার যাথার্থ্য যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় না। যথেষ্ট বলে কিছু নেই। সন্দেহ রয়েই যায়। কোনো সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার যখন রাস্তা নেই—যতই তার সমর্থনে তথ্য জমাই না কেন—তখন স্পষ্টতই উলটো নিশ্চিতির চেষ্টা করা উচিত। কী ঠিক তা না-হয় নিশ্চিত জানতে পাব না। কী ভুল তা তো জানা যায়। অনুসন্ধানের কাজ তা হলে ঠিক সত্যান্বেষণ নয়, ভ্রান্তিনাশ।

এই মেজাজটার যে পরিস্ফুটন শারলক হোমসের মুখে পাই তা নিয়ে তলিয়ে ভাবা দরকার। হোমস বলেছিলেন, আর-সব উপকল্প যখন ডুবে যায় তখন অবশিষ্ট উপকল্পটাই ঠিক, সে যতই অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য হোক-না কেন। এই কথার সঙ্গে খাঁটি বৈজ্ঞানিক উপকল্পবাদের একটা বিরাট তফাত রয়েছে। 'অবশিষ্ট উপকল্পটা' কী ব্যাপার ? হোমসের আত্মবিশ্বাস সুপরিচিত। একটা পরিস্থিতির যা যা ব্যাখ্যা সম্ভব প্রত্যেকটাই ওঁর মাথায় আসবে ব'লে ভরসা রাখেন। তাই ভাবতে পারেন একটা বাদে আর-সমস্ত উপকল্পকে অসার প্রতিপন্ন করার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় দেখা গেছে যে, কোনো

সমস্যারই প্রত্যেকটা কল্পনীয় সমাধান মাথায় আসে না, পৃথিবীর তামাম বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে মাথা খাটালেও। এজন্যে একটা কথা চালু আছে, 'কল্পনাশক্তির অভাব দিয়ে প্রমাণ-অপ্রমাণ হয় না।' কোনো উপকল্পের সমর্থনে কেউ 'এটা ঠিক না হলে এর বদলে আর কী হতে পারে?' এরকম ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে পার পাবেন না। কালকেই যদি কেউ বিকল্প বার করে? প্রত্যেক উপকল্প সম্বন্ধেই মনে রাখতে হয়—অমর কে কোথা কবে?

সত্য আবিষ্কারের কোনো সোজা রাস্তা নেই তা হলে। এজন্যেই সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিজ্ঞানেও 'শত পুষ্প' কথাটা উঠেছে বার বার। একই ব্যাপারের শ-খানেক বিকল্প ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেই ভালো। তা হলে অন্তত জানতে পারব কোনগুলো ভুল ব্যাখ্যা। বিভিন্ন পথের পন্থীরা পরস্পরের ভুল দেখিয়ে দেবেন। ছিদ্রান্বেষণ ভয়ানক শক্ত কাজ নয়। তথ্যের আঘাতে কোন কোন তত্ত্ব খারিজ হয়ে যাচ্ছে তা জানবার দরকারও আছে। তাতে একমাত্র সত্যে পৌঁছই বা না পৌঁছোই, অন্তত জলজ্যান্ত ভুলের হাত থেকে রেহাই পাব। কোনো একটা বিষয়ে উপকল্প, যথাসময়ে তারও অপ্রমাণ—এটাই বিজ্ঞানে প্রগতির একমাত্র পথ ব'লে উপকল্পবাদের ধারণা।

উপকল্পবাদের অবশ্য এখানে শেষ নয়, শুরু। যে-কোনো নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিকের মনেই প্রশ্ন ওঠে বাস্তব অর্থাৎ জটিল পরিস্থিতির ব্যাখ্যা নিয়ে। ধরা যাক, একটা জটিল বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে বসে বলবার দরকার হলো যে অনেকগুলো উপকল্পকে একসঙ্গে কাজে লাগালে তবে ব্যাখ্যা মিলবে। অথচ অত কাঠ-খড় পুড়িয়েও মনের মতো ব্যাখ্যা হলো না। তখন কী করা? প্রাসঙ্গিক সব কখানা উপকল্পকে আস্তাকুড়ে পাঠাব? তত্ত্বের এক বা একাধিক অংশের দোষ ধরে নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করব? এমন নতুন কোনো ভাবনা আমদানী করতে চাইব যার সহযোগিতা পেলে আগেকার উপ-কল্পগুলোই ঠিকমতো কাজ দেবে?

এ-সব কথা মনে হতেই অবধারিতভাবে পৌঁছে যাচ্ছেন তৃতীয় বাঁকে।

প্রকল্পের কথা

হাইপথিসিসের প্রতিশব্দ হিসেবে উপকল্প বলছি। এটা কিন্তু নতুন। সংস্কৃতে বলত প্রকল্প। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিভাষা চলন্তিকা আর সংসদ

অভিধানের পরিশিষ্টে পাওয়া যায় তাতেও তাই আছে। কিন্তু আধুনিক প্রয়োগে প্রকল্প বলতে তো বড় মাপের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা বোঝায়। খবরের কাগজ ইত্যাদি গণমাধ্যমে প্রকল্প শব্দটার এই ব্যবহারই চালু। লোকের বোধহয় ধারণা জন্মেছে যে প্রচেষ্টার পিছনে পরিকল্পনা থাকলে যা দাঁড়ায় তাকে প্র-কল্প বলে। ধারণাটাকে অগ্রাহ্য করার কারণ দেখি না। হাই-পথিসিস অর্থে উপকল্প বলছি সেজন্যে। প্রকল্প কথাটার কাজ পালটে গেছে। এ বিবর্তন মেনে নেওয়াই ভালো।

উপকল্পের শিকড় থাকে গবেষণার প্রকল্পবিশেষে। যে-কোনো বিজ্ঞানীই মোটের উপর একটা চিন্তাধারা অনুসারে কাজ করেন।

যেমন ধরুন মার্কসীয় গবেষণার ঐতিহ্য। এটা তো অন্য ধরনের দৃষ্টান্ত। মার্কসীয় প্রকল্পের অন্তত চারটে আনন রয়েছে—বিজ্ঞান, সংগঠন, ব্যক্তিগত জীবনরীতি, শিল্প সংস্কৃতি। তর্কের খাতিরে তবু ধরেই নিন না, মার্কসীয় ঐতিহ্য প্রধানত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাবিশেষ। এ প্রসঙ্গে অনেকে বলেন যে মার্কসের রেখে যাওয়া আসল দামী জিনিস এক রাশ উপকল্প নয়, একটা ফলপ্রসূ চিন্তাপদ্ধতি যার সাহায্যে বাস্তব পরিস্থিতিতে সাড়া দিয়ে লাগসই উপকল্প ভাবা সহজ। মার্কসিজম ইজ এ মেথড রাদার দ্যান এ থিওরি।

সাধারণভাবে সব বিজ্ঞানের বেলাতেই এ কথা খাটে। নিউটনকে অনেকে শাস্ত্রীয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রবর্তক ভাবেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক পদার্থবিজ্ঞান যে শাস্ত্রীয় চিন্তাকে প্রতিদ্বন্দ্বে হারিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সেই চিন্তা কিন্তু সরাসরি নিউটনের নয়, লরেন্ৎসের অনেকাংশে স্বাধীন রচনা। রচনার রীতি আর মূলসূত্র অবশ্য নিউটনীয়। বলতে পারি নিউটন পদার্থ-জিজ্ঞাসার একটা প্রকল্প চালু করে দিয়ে তার একাংশের রূপায়ণ করে গেছিলেন। বাকিটা ছিল প্রতিশ্রুতি, ক্রমশ প্রকাশ্য। সে-সব কথা রেখে তত্ত্বটাকে উত্তরোত্তর পূর্ণাঙ্গ চেহারা দেওয়ার যে প্রকল্প—নিউটনের পদ্ধতিতে জগতের বিশ্লেষণ আঁকার যে প্রকল্প—তাতে কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক কর্মী হাত লাগিয়েছেন, লরেন্ৎস একজন।

নিউটন বা মার্কসীয় বা অন্য কোন প্রকল্প ঠিক কী তা ভেঙে বলা শক্ত। কয়েকটা উপকল্প মিলিয়ে যে তত্ত্ব দাঁড়ায় তা ব্যক্ত করার চেয়ে একটা প্রকল্পের চেহারা পেশ করা অনেক বেশি কঠিন কাজ। কারণ প্রকল্পে অতীত ভবিষ্যতের ব্যাপার আছে। আর আছে মুখ্য গৌণ। প্রকল্পের অস্থি হিসেবে

কিছু কিছু মুখ্য ধারণা দীর্ঘ মেয়াদে কাজ করে যায়। তাদের ঘিরে অসংখ্য গৌণ উপকল্প **মাংসের** মত পরিবর্তনশীল। নতুন তথ্যের চোট লেগে গৌণ উপকল্প প্রায়ই পালটে পালটে যায়। মুখ্য ধারণাও বদলায়, কিন্তু আস্তে আস্তে। মুখ্য আর গৌণ অংশের রদবদলের ফলে ভবিষ্যতে প্রকল্পের কোন দিকে মোড় নেবার কথা তার প্রতিশ্রুতিগুলোও ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে। কাজেই বিশেষ কোনো মুহূর্তে একটা প্রকল্পের অর্থবহ সামগ্রিক ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব। প্রাপ্তি আর প্রতিশ্রুতির ধরন মিলিয়েই বোঝার চেষ্টা করতে হয়। বাল্যকালে প্রকল্পের যা অবস্থা থাকে সে তুলনায় মাঝবয়সে স্থৈর্য বেশি, গতিক্ষমতা কম, এসব হিসেবও রাখতে হয়।

বুঝতেই পারছেন, কোনো প্রকল্পের মূল্যায়ন বা দুই প্রকল্পের প্রতিদ্বন্দ্বে হারজিত নির্ণয় অনেকটাই অবহিত মনের কল্পনাশক্তি খাটিয়ে অনুভব করার ব্যাপার। কাগজে-কলমে তাত্ত্বিক কলকব্জার মূল্যতুলনা কষে রায় দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা কার্যত তা করেনও না। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে স্পষ্ট হয়েছে যে ১৯০৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লরেন্ৎসের শাস্ত্রীয় ধাঁচ আর আইনস্টাইনের আপেক্ষিক ধাঁচের মধ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাতে, নিছক বহিরঙ্গ যাথার্থ্যের দিক থেকে কার জোর বেশি, এ প্রশ্নটা তেমন জরুরি ছিল না প্রথম ক বছর। বহির্জগতের যেটুকু সাক্ষ্যপ্রমাণ তখনকার পদার্থবিদের জানা ছিল তার নিরিখে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের তুলনায় লরেন্ৎস পিছিয়ে ছিলেন না। শাস্ত্রীয় ধাঁচের সর্বনাশ ডেকে আনল পদার্থবিজ্ঞানীদের এই বোধ যে ওই ধাঁচ আনপ্রমিসিং, ওর প্রতিশ্রুতি সব দেউলে হয়ে গেছে আইনস্টাইন আসরে নেমেছেন ব'লে।

যে প্রকল্প প্রমিসিং বা সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত তার সম্ভাবী মুখ্য অংশে এরকম দৃষ্টি থাকে। সেই দৃষ্টিকে প্রকাশ করে কয়েকটা কেন্দ্রীয় প্রতিজ্ঞা বা প্রপোজিশন। সচরাচর বাস্তব জগতের পক্ষে বড্ড সরল হলেও প্রতিজ্ঞাগুলোতেই দৃষ্টির ধরনটা স্পষ্ট হয়। প্রতিজ্ঞার আকারে পরিস্ফুট দৃষ্টিকে বলতে পারি প্রকল্পের ভাবনীতি বা আইডিয়লজি। প্রতিজ্ঞার লৌকিক মানে যে প্রতিশ্রুতি সে দিক দিয়ে মনে করা চলে, প্রকল্পের দৃষ্টি তার ভাবনৈতিক চেহারায় স্পষ্ট করে কথা দেয় যে অমুক পথে একটা বিষয়কে মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তে আনা হবে। কথা রাখার আয়োজন রয়েছে প্রকল্পের একদম বহিরঙ্গে। সেখানে পরস্পর জড়িত উপকল্পেরা

একেকটা তত্ত্বের জট বেঁধে তথ্যদের সুদূরপ্রসারী অন্তর্দর্শী বর্ণনা আর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে।

তত্ত্বদের, আরো বেশি তাদের অঙ্গীভূত উপকল্পদের, জন্মমৃত্যু ঘটে ঘন ঘন। তবে কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনের মতোই জন্ম মানে প্রায়ই মৃত কারুর পুনরুজ্জীবন। পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া তত্ত্ব কিছুদিন ছাই সেজে ফের গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে এরকম ফীনিক্সবাজি বিরল নয়। কোনো প্রকল্পের প্রতিজ্ঞা অত ঘন ঘন বদলায় না। সেজন্যেই নিউটনের সঙ্গে লরেন্‌ৎসের নিরবচ্ছেদ অনুভূত হয়। প্রতিজ্ঞার যেন বেশভূষার দুচারটে জিনিসে একটু উনিশ-বিশ হলেই বাইরের উপকল্পগুলো অনেকখানি পালটে যায়, ঠিক যেমন ব্রহ্মার এক লহমা মর্ত্যলোকে সুদীর্ঘকাল।

আগের বাঁকে বলেছিলাম না, অনুমিতি আর উপকল্প হিসেবে আন্দাজের যে দুই ভূমিকা তাদের একসঙ্গে দেখা দরকার? এবার সে কথাটা মানে পেল। প্রকল্পের ভাবনীতি থেকে প্রায় যেন হিসেব করেই, অনুমানের নেমেআসা (অবরোহী) রাস্তায়, কোনো আন্দাজে পৌঁছতে পারি আমরা। আন্দাজটার উপর অনুমানের আলো ফেলে বলছি, ওই দেখো, অনেক খবরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা যে মস্ত বড় প্রকল্প ফেঁদেছি তার অন্যান্য অংশ থেকে এই আন্দাজটা বেরিয়ে আসে ; বাকি ছবিটা যদি ঠিক হয় তাহলে এই আন্দাজটার ভাগ্যে তথ্য-সমর্থনের শিকে না ছেঁড়ার কারণ নেই। অন্য দিক থেকে, আন্দাজটাকে উপকল্প হিসেবে একা দাঁড়াতে হচ্ছে তথ্যদের যাচাইরের সামনে, বিরোধী উপকল্পদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এই ভূমিকায় সে ভঙ্গুর। একটা উপকল্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পেলে বিজ্ঞানী একই রীতিতে আরো ভালো কিছু ভাবতে পারেন বলে তাঁর যতই ভরসা থাকুক-না কেন, উপকল্পটা তো জানে যে সে একেবারে চুরমার হয়ে যেতে পারে। অথচ আন্দাজ তার প্রকল্পের রীতিসিদ্ধ অনুমিতি হিসেবে সার্টিফিকেট পেয়ে বেরিয়েছে। সেই ভূমিকায় আন্দাজ আশাপুষ্ট, মজবুত।

আন্দাজ কেন পলকা তা দ্বিতীয় বাঁকে জেনেছিলাম। বর্তমান বাঁকে দেখছি কেন মনে হতে পারে যে, যদি আন্দাজ করে থাকিস 'সে পণ তোমার রবেই রবে।' একটা প্রকল্প যখন বাহান্নটা কাজ তার রুচিমাফিক নামিয়েছে তখন তিপ্পান্নরটাও সে পেরে যাবে—এই মেজাজ ভরসার উৎস।

প্রকল্পের গতি

প্রকল্পের বাঁকে অর্থাৎ তৃতীয় বাঁকে প্রথম আর দ্বিতীয় বাঁকের উপাদানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা ডায়ালেকটিক চলছে। প্রথম বাঁকের স্থায়ী অবদান (ক) সাধারণীকৃত সরল তত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা, (খ) অবরোহী অনুমানের সিঁড়ি বেয়ে ব্যাপক কথার সঙ্গে প্রাদেশিক কথায় সুশৃঙ্খল যোগ। দ্বিতীয় বাঁকে রেখে গেছে (গ) তথ্য থেকে কিছু দূরে বসে স্বাধীন কল্পনাচর্চার যে ভূমিকা তার স্বীকৃতি, (ঘ) শত পুষ্পের আর সমালোচনার নীতি: যা যা মনে এল তা বাস্তবে খাটিয়ে দেখতে হবে কোনটা মিলছে ভালো।

আগের দুই বাঁকে গরহাজির যে উপাদান তৃতীয় বাঁকে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো প্রকল্পদের পরস্পর সমালোচনায় সমৃদ্ধ নিরিখ ব্যবহারের অবকাশ। প্রকল্পের তো দুটো দায়িত্ব যুগপৎ গুরুত্ব পাচ্ছে এবার, বাহ্য উপকল্পদের তথ্য সামলানোর দায়, আর, অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাব্যবস্থার আত্ম-সংগতির জোরে নিত্য নতুন ফরমাসে উপকল্প রচনার সামর্থ্য ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব। সোজা কথায়, কাজও করতে হবে সুস্থও থাকতে হবে। এই অবস্থায় এক প্রকল্পের আরেক প্রকল্পের সমালোচনা নানা পর্যায়ে করতে পারে। যেমন, তোমরা কাজ করছ না, অথবা স্বাস্থ্য নষ্ট করছ, অথবা দুটোই, এমনভাবে চলছ যে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যায়াম আর কাজ নামানোর শ্রম দুটো আলাদা বেগার খাটায় পর্যবসিত হয়েছে।

সব চেয়ে বড় কথা হয়তো এই যে প্রকল্পীরা এভাবে নিজেদেরই সমালোচনা করতে পারে। তাতে প্রকল্প এগোবে আরো সচেতনভাবে। বিজ্ঞানীরা তো আর নির্গুণ আত্মায় প্রত্যয়ী নন। তাঁদের আত্মনিষ্ঠার রকমই বার বার ভুল শুধরে নিজেকে অন্য করে তোলা।

সমালোচনা যাতে যান্ত্রিক হয়ে না পড়ে সেজন্যে খেয়াল রাখা দরকার যে প্রগতি কোনো ভোজসভা বা পেলব শিল্পকর্ম নয়। খণ্ডে খণ্ডে অসম গতিই প্রত্যাশিত। বিশেষ করে বলি, কিছুদিন প্রকল্পের বহিরঙ্গ যাথার্থ্যের পরিশ্রমী অন্বেষণ আর তার পর কিছুদিন প্রতিজ্ঞাতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের দিকে মন দেওয়া, এ দুই ঝোঁকের প্রায়ই পালাবদল চলতে থাকবে সুস্থ বিবর্তনে।

যেমন, গত বছর মার্ক্সীয় গবেষণার প্রকল্প ই. পি. টমসনের সবল তথ্যনিষ্ঠ ভাবনার অভিঘাতে বহিরঙ্গ যাথার্থ্যের চর্চায় অনেক বেশী ব্যাপৃত

হয়েছে। পুলানৎসাস আর আলতুসের-সুলভ ভারিক্কি তত্ত্বের চর্চা নিছক আঁতেলপনার গজদন্তমার্গ ধরেছিল। তার প্রাধান্য রাতারাতি ঘুচে গেছে। এ ব্যাপারে 'বিজয়ী' মহলে উল্লাস চলছে। সেটা কি সাবালক বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় ? প্রতিক্রিয়াটা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু তথ্যমনস্ক মহল ওই স্টীমটুকু ছেড়ে নেবার পর মার্কসীয় প্রকল্পে সবারই হয়তো আলোচনা করা দরকার বড় প্রশ্নগুলো তুলে। সেই আলোচনার পশ্চাদ্ভূমিতে রয়েছে পালাবদলের পৌনঃপুন্য। সন্দেহ নেই, এখন তথ্যের পালা। কিন্তু টমসন-কথিত সর্বহননতন্ত্র তার শেষ সীমা ছাড়ালে যে পারমাণবিক বিশ্বনাশ ঘটবার তা যদি এ যাত্রা না ঘটে তা হলে, তত্ত্বের যুগ তো ফিরে আসবে আবার। এই অনিবার্যতাকে স্বীকৃতি জানাবার ধরন কী হতে পারে ?

তূণীর তৈরী

মার্কসীয় প্রকল্পের বাইরে অন্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানে অনেকে বলেন, একই প্রকল্পের অন্তর্নিহিত দৃষ্টির রূপায়ণ হিসেবে একটার বেশি প্রতিজ্ঞাতন্ত্র আর অনেক সেট উপকল্প তূণীরে ভরে রাখা ভালো। কোন তীর কখন ছুঁড়তে চাইব তার তো ঠিক নেই। তথ্যের যুগে তত্ত্বকথা বা তত্ত্বের যুগে তথ্যপাণ্ডিত্য হঠাৎ কাজে লাগে। আপনি দরকার মতো তীর নিতে গিয়ে তূণীরে যদি না পান তা হলে বুদ্ধদেব বসু তো বলবেনই 'কোথায় অর্জুন ! কোথায় কামরূপ ! এক বসন্তেই শূন্য তূণ'।

তূণীর সাজিয়ে প্রস্তুত রাখতে হয়। কোন তীর ভালো কোন তীর মন্দ তা নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি মত দিয়ে বসা হঠকারিতা। অবশ্য বেশি বেশি স্থৈর্য দেখালে প্রকল্পের চরিত্রটাই ঝুলে থাকে। কিছুদিন অন্তর হেস্তনেস্ত করে নিতেই হয় কোনো কোনো বিষয়ে। তূণীরে বিকল্প যত কম থাকবে, প্রকল্পের মুহূর্তবিশেষে বক্তব্য যত পরিস্ফুট, ততই স্পষ্ট টের পাওয়া যাবে প্রকল্পের ভিতরে বাইরে সঙ্গতি বাড়ছে কিনা।

তূণীরে বৈচিত্র্য-বাড়ানো কমানো রণকৌশলের ব্যাপার। যারা তূণীর ব্যাপারটাই সইতে নারাজ তারা কথায় কথায় মোর্চা ভাঙে, একটা প্রকল্পকে ফাটিয়ে চৌচির করে দেয় যাতে খণ্ডিত ব্যবস্থায় তাদের ক্ষুদ্র প্রকল্পটা বিশুদ্ধতম পথে চলতে পারে। যারা তূণীরপন্থার অতিভক্ত তারা নীতিগত তফাতও অগ্রাহ্য করে সব প্রকল্প মিলিয়ে দিতে চায়। এই দুরকম লোকই

তূণীরের প্রশ্নটাকে ভুল করে রণ-নীতির ব্যাপার ভেবে যথাক্রমে বিরোধিতা আর সমর্থন করে। রণ-কৌশলে রাখলে ঝামেলা বাধে না।

শত পুষ্প কথাটার মানে তূণীর ধারণার সাহায্যে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

শেষমেষ : সত্যি কথা

যাঁরা বিজ্ঞানের প্রগতি চান তাঁদের আমি ঠিক কী চাইতে বলছি সে কথা মোটামুটি নিবেদন করে এবার ছেড়ে দেওয়া উচিত। কী দাঁড়াল সব মিলিয়ে?

কোনো একটা গবেষণাক্ষেত্রের পরিধি ঠিক কী সেটাও তো নিরপেক্ষ-ভাবে বলা কঠিন। মার্কসীয় প্রকল্প যেভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানকে মেলায় বা আলাদা করে সমাজ-বিজ্ঞানের হেবার-প্রবর্তিত প্রকল্প তা করে না। যাই হোক, মোটামুটি নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে একাধিক দ্বন্দ্বী প্রকল্পে বসে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেন।

সে গবেষণা ঠিক সত্যান্বেষণ নয়। 'সত্যি' তো আদর্শের কথা। যে কোনো প্রকল্প দুরকম সমস্যার মোকাবিলা করে—তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের অসংগতি আর প্রতিজ্ঞাতন্ত্রের অসংহতি। এই দু-জাতীয় সমস্যা সাবলীল-ভাবে কাটিয়ে উঠতে উঠতে কোনো প্রকল্প যদি পর পর বড় ঝুঁকি নিয়ে সাংঘাতিক সাফল্য অর্জন করতে থাকে, তা হলে ভ্রান্তিনাশের প্রতিদ্বন্দ্বে তার জয় সুনিশ্চিত। সেটা না হলে স্তিমিত প্রতিদ্বন্দ্ব লেগেই থাকে।

প্রকল্পের কেন্দ্রে যে বিশেষ দৃষ্টি, তার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি একটা প্রতিজ্ঞা-তন্ত্রে আর পরোক্ষ প্রকাশ এক রাশ উপকল্পে যারা সে-সব প্রতিশ্রুতি পালনের উপায়। উপকল্পরা প্রায়ই মার খায়, প্রতিজ্ঞারা মাঝে মাঝে। পুরোনো উপকল্প ছেড়ে নতুন উপকল্প পরার কাজ কতটা ক্ষিপ্র সপ্রতিভ সাহসীভাবে করতে পারছে তাই দেখে একটা প্রকল্পের স্বাস্থ্য টের পাওয়া যায়। সাহস কিসে? না, নতুন উপকল্প এমন হওয়া চাই যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়ার বেশ খানিকটা সম্ভাবনা আছে, কারণ সেই ঝুঁকি যে বৈজ্ঞানিক যত কম নেবেন তিনি তত কম বলছেন। ('শাদা জিনিসের রঙ শাদা' এর বিরুদ্ধে তথ্য থাকতে পারে না। সুতরাং এটা বললে কিছু বলা হয় না। এটা উপকল্প নয়।)

কখনো কখনো একটা প্রকল্পের কর্মীরা ঠিক করেন যে, অনেক সেট উপকল্প পাশাপাশি রেখে দেখা দরকার কোন সেটটা তথ্যের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ খাপ খায়, কারণ সব কথা সেটই প্রকল্পের মূল সুরে সুরেলা, অতএব পরীক্ষা করে দেখার যোগ্য। এই ব্যাপারটার নাম তূণীর সংকলন। এতে সাময়িক অনিশ্চয়তা আসে কিন্তু কৌশলটা ঠিকমতো ব্যবহার করলে আখেরে লাভ হতে পারে। এখনো বলা মুশকিল, কারণ তূণীর ব্যাপারটার সচেতন আবির্ভাব বেশ সাম্প্রতিক।

শিবিরে শিবিরে লড়াই আর শিবিরের তূণীরে শান্তিপূর্ণ বিকল্পতা—এই দুটো বৈচিত্র্য মিলিয়ে শত পুষ্প। শত পুষ্প ছাড়া বিজ্ঞান এগোয় না। বিনা তুলনায় সমালোচনা অসম্ভব।

আর সত্যি কথা? এই কাণ্ডকারখানায় সত্যি বলে যদি কিছু থাকে তা আছে প্রকল্পের স্বাস্থ্যে। প্রকল্প যখন সুস্থ গতিতে এগোচ্ছে তখন ভরসা রাখতে পারি যে, নানারকম নির্ভুল সত্যি কথা জানা যাচ্ছে, যদিও কোন কথাগুলো সত্যি সেটা কবে জানা যাবে তার কোনো ঠিক নেই। অতর্কিতে ভুল বেরিয়ে গিয়ে বহুদিনের ধরে নেওয়া সিদ্ধান্ত ফুটো হয়ে চুপসে যায়। প্রকল্পরা নিজেদের আর পরস্পরকে যে চাপ দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলতে থাকে তার কোনো নিশ্চিন্ত বিকল্প হতে পারে কি? মার্কসবাদী প্রকল্পে বিশেষ করে যে প্রশ্ন ওঠে তা হলো, বিজ্ঞান-চিন্তার তিন বাঁকের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ধরনের চিন্তা বা চিন্তা-দ্বন্দ্বকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক দর্শন আখ্যায় অভিহিত করা যায়? দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে সমকালীন বিজ্ঞানের সম্পর্ক কী?

গ্র ন্থ প রি চি তি

বাঙলা ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নানা দিক থেকে ধরবার চেষ্টা চলছে আজকাল। সংস্কৃতের আঁচল থেকে মুক্ত করে বাঙলাকে তার নিজের সত্তায় দেখতে চেয়েছিলেন উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ বা রামেন্দ্রসুন্দরের মতো মনীষী। সেই চেষ্টাই আরেক ধাপ এগিয়ে যায় বিংশ শতাব্দীতে। আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি আজ ভাষার এমনসব দরজা খুলে দেয় যা সংস্কৃত বা ইংরেজীর শাস্ত্রীয় ব্যাকরণের অনাধিগম্য ছিল। সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ করে 'চমস্কি-বিপ্লব' ভাষা-আলোচনার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাঙলার পদ আর বাক্যের গঠন নিয়ে নতুন আলোচনার কিছু কিছু চেষ্টা পাবেন এ বইয়ে। আর পাবেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণরীতি আর চমস্কি-বিপ্লব সম্বন্ধে আলাদা উপস্থাপন।

লে খ ক প রি চি তি

প্রবাল দাশগুপ্ত: জন্ম কলকাতা শহরে ১৯৫৩-র সেপ্টেম্বরে। কৃতী ছাত্র, ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ নেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে (১৯৭০-৭৩), পুণের ডেকান কলেজে (১৯৭৪-৭৫), এবং নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৭৫-৭৯)। ১৯৮০ থেকে ডেকান কলেজে ভাষাবিজ্ঞানে অধ্যাপনারত। ইতিপূর্বে এই বিষয় পড়িয়েছেন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নানা পত্র-পত্রিকায় লিখছেন ১৯৭২ থেকে। ১৯৮২-৮৭ সম্পাদনা করেছেন ইণ্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স্।

বিভিন্ন ভাষা জানেন। এসপেরান্তো ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্র-কবিতা-সংকলন 'প্রিমিৎসো' (প্রথম অঞ্জলি), টি. কে./স্তাফেতো, অ্যান্টওয়ার্প ১৯৭৭, এঁর প্রথম প্রকাশিত বই।